বাংলাদেশের উপন্যাসে জনজীবন (১৯৪৭-১৯৭১)

গবেষক

রীতা বসু

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

জুলাই, ২০১০ইং

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের উপন্যাসে জনজীবন (১৯৪৭-১৯৭১)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. ওয়াকিল আহমদ

সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

449858

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

রীতা বসু

এম.ফিল. গবেষক

রেজিঃ নং-১৮/২০০১-২০০২

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ-কথা

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. ওয়াকিল আহমদের তত্ত্বাবধানে এম. ফিল. কোর্সে ভর্তি হই। আমার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম-'বাংলাদেশের উপন্যাসে জনজীবন (১৯৪৭-১৯৭১)'। এই অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা-প্রণয়ণে ও রূপরেখা নির্মাণে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. ওয়াকিল আহমদ এর পরামর্শ, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার কথা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ মতামত ও অর্থবহ নির্দেশনা আমার কার্যক্রমকে গতিশীল ও সফল করে তুলতে সাহায্য করেছে। গবেষণা কালে নানা পর্যায়ে প্রাজ্ঞ পরামর্শ ও মূল্যবান অভিমত দিয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ, রফিকউল্লাহ খান, বায়তুল্লাহ কাদেরী ছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মারুফ হোসেন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিষয়ের প্রভাষক ড. ময়না তালুকদার আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

449858

গবেষণা কাজে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার ও আমাদের বিভাগীয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ সূত্রে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। গবেষণাকালে আমার বন্ধু শওকত মিল্টন এবং ছোটভাই সমতুল্য মোঃ ইয়াসিন সোহাগ ও আহসান কবীর শুভ নানাভাবে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে । তাদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমার গবেষণাকর্ম কম্পিউটারে কম্পোজ করার কষ্টকর কাজটি সম্পন্ন করেছে মোঃ সানি আলম। এতদ্‌সঙ্গে সাহিত্য পত্রিকা সরবরাহকারী মোঃ অলিউল্লাহ খন্দকারের সহায়তার কথাও ভুলে যাবার নয়। এঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সর্বশেষে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই একান্ত বন্ধু-বর জাকির হোসেন এবং আমার দুই ছেলে অনাবিল মাধুর্য ও অপার্থিব অনুভবকে। তাদের সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা আমাকে সর্বদা প্রাণবন্ত রেখেছে ও কাজে উৎসাহ যুগিয়েছে।

উপস্থাপক
রীতা বসু
২৭।৭।১৫
রীতা বসু
এম. ফিল. গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬১৯০০-৭৩/৬০০০; ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩
ই-মেইল bangla@du.bangla.net

Department of Bengali
University of Dhaka
Dhaka—1000, Bangladesh
Call : 9661900-73/6000; Fax : 880-2-8615583
E-mail : bangla@du.bangla.net

Date : ২৬-৭-১০

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম.ফিল গবেষক রীতা বসু আমার তত্ত্বাবধানে 'বাংলাদেশের উপন্যাসে জনজীবন (১৯৪৭-১৯৭১)' শীর্ষক গবেষণাপত্রটি রচনা সম্পন্ন করেছেন। তাঁর রেজিস্ট্রেশনের নম্বর ১৮/২০০১-২০০২ এবং যোগদানের তারিখ ১১-০৫-০৪।

আমি যতদূর জানি, গবেষণাপত্রটি গবেষকের জ্ঞানবুদ্ধিপ্রসূত রচনা এবং এটি অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা গবেষণা-প্রতিষ্ঠানে উপস্থাপিত হয়নি অথবা এর কোন অংশ মুদ্রিত আকারে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এখন এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য বিধি অনুযায়ী মূল্যায়ণের জন্য জমা দেওয়া হলো।

ওয়াকিল আহমদ

(অধ্যাপক ড. ওয়াকিল আহমদ)
সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক,
ও
গবেষণা-তত্ত্বধায়ক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসই সর্বাধিক সমৃদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের বিপর্যয়জনিত অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে বাংলাদেশের কথা সাহিত্যিকগণ উপন্যাস রচনায় একটা নিজস্বতা অর্জন করেন। এ সময় প্রধানত গ্রামীণ নিম্নবিত্তের পোড় খাওয়া মানুষের জীবনযাপন ও দেশ বিভাগ জনিত মানুষের হতাশা লেখকদের শক্তিশালী লেখনিতে উঠে আসে। বাংলাদেশের উপন্যাসে আধুনিকতার উত্তরণ ঘটেছে মূলত গ্রামীণ জনগোষ্ঠির বৈষম্য-পীড়িত সমাজ কাঠামোকে কেন্দ্র করে। আমি ১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালে রচিত বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ এবং নগরের জনজীবনের উপর মূলত দৃষ্টিপাত করেছি। বাংলাদেশের উপন্যাস সম্পর্কে কিছু কিছু মূল্যবান গবেষণাও হয়েছে। আমার প্রস্তাবিত বিষয় সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে কোন গবেষণা হয়নি। বাংলাদেশের উপন্যাসে খেটে খাওয়া মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামী জীবনের কথাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে এই অভিসন্দর্ভে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমিতে সমকালীন বাস্তবতায় যেসব উপন্যাস লেখা হয়েছে সেইসব উপন্যাসে জনজীবনের বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে আলোচনা করেছি।

তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে আমি আমার প্রস্তবিত বিষয়টি আলোচনা করেছি। প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি সম্পর্কে একটা আনুপূর্বিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রধান প্রধান ঔপন্যাসিকের জীবনবৃত্তান্ত ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা করেছি ও এতদসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের উপন্যাসে জনজীবনের স্বরূপ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যা আমার অভিসন্দর্ভটির ধারণাকে আরোও স্পষ্টতর করে তুলেছে। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের উপন্যাসকে চার ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছি। প্রথম ভাগে গ্রামীণ জীবন ভিত্তিক উপন্যাস, দ্বিতীয় ভাগে নগর কাহিনী-প্রধান উপন্যাস, তৃতীয় ভাগে গ্রাম-নগর মিশ্র জীবন ভিত্তিক উপন্যাস এবং চতুর্থ ভাগে আছে ঐতিহাসিক, রূপকাশ্রয়ী ও অন্যান্য বিষয়ক উপন্যাস। 'উপসংহার' অংশে বর্তমান গবেষণা থেকে প্রাপ্ত বিষয়-ভাবনা ও অভিজ্ঞানের প্রধান সূত্রসমূহকে উপস্থাপন করেছি। পরিশেষে আছে সমন্বিত 'গ্রন্থপঞ্জি'।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি : ১৯৪৭-১৯৭১	১-৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ প্রধান প্রধান ঔপন্যাসিকের জীবনবৃত্তান্ত ও সাহিত্যকর্ম	১০-৩০
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ উপন্যাসে জনজীবনের স্বরূপ বিশ্লেষণ	৩১-১১৭
	গ্রামীণ জীবন ভিত্তিক উপন্যাস	৩২-৬৩
	নগর কাহিনী-প্রধান উপন্যাস	৬৪-৯২
	গ্রাম-নগর মিশ্রজীবন ভিত্তিক উপন্যাস	৯৩-১০১
	ঐতিহাসিক, রূপকাশ্রয়ী ও অন্যান্য বিষয়ক উপন্যাস	১০২-১১১
উপসংহার		১১৮-১২০
গ্রন্থপঞ্জি		১২১-১২৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি : ১৯৪৭-১৯৭১

১৯৪৭ সালে মূলত হিন্দু ও মুসলমান দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তানের দু'টি অংশ (Wings) পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান ; মাঝখানে ভারত ভূ-খণ্ডের প্রায় ১২০০ মাইলের ব্যবধান। এরূপ একটি রাষ্ট্রকে প্রথম থেকেই বিজ্ঞজন অবৈজ্ঞানিক রাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করেছেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরপরই রাজনৈতিক ঘটনাবলী মানুষের জীবনকে বিভিন্নভাবে আলোড়িত করে। বদলে যায় মানুষের সামগ্রিক জীবনধারা। পূর্ববাংলার মানুষ বুঝতে পারে যে, এই স্বাধীনতা এ অঞ্চলের মানুষের জন্য কোন সুফল বয়ে আনবে না।

"পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ছোটবড় নানা ঘটনা, সরকারী নীতি ও কর্মসূচী সরকারী ক্ষমতাবানদের ভাষ্য, বিভিন্ন ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় এই বিষয়গুলি ক্রমে স্পষ্ট হয় যে এই অঞ্চলের মুসলমানেরা পাকিস্তানি ও মুসলমান পরিচয় নিয়ে অন্যদের সাথে সম্পর্ক গঠনে আগ্রহী হলেও পাকিস্তানি ক্ষমতাবানদের তাতে কোন আগ্রহ নেই ।"[১] ফলে পরিলক্ষিত হয় যে পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। পূর্ববাংলার মানুষ হয়ে পড়ে আরও অসহায়। কারণ ব্রিটিশ বিতাড়নের শুরু থেকে এবং তার অনেক পরেও পূর্ববাংলাকে নিয়ে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অঙ্গনে যা ঘটেছে এ উপমহাদেশের ইতিহাসে তা সত্যিই দুঃখজনক। শুরু থেকেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের মানুষ শোষণ ও বৈষম্যের শিকার হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতিতে কাঁচামালসহ অন্যান্য দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত উপকরণের শতকরা ৮০ ভাগই যেত পূর্ব পাকিস্তান থেকে । এমনকি "পাকিস্তানের রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস থেকে যায় পূর্ববাংলায়। ১৯৪৮-'৪৯ ও ১৯৫৪-'৫৫ সালের মধ্যে অর্জিত পাকিস্তানের সকল বৈদেশিক মুদ্রার ৫১.৫% আসে পূর্বপাকিস্তানের রপ্তানি থেকে, কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান অর্জনকারী পূর্ব পাকিস্তান হলেও তার প্রধান ব্যবহারকারী হতে দেওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানকে।"[২] এদিকে নগরায়ণ, শিল্পায়নসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার থেকে পূর্ববাংলাকে রাখা হয়েছিল অবহেলিত করে। যে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতো তা প্রায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল অথবা বলা যায় কোথাও কোথাও বিপর্যস্ত হয়েছিল

Dhaka University Institutional Repository

তো বটেই। "বাংলাদেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ... ঋণগ্রস্থ চাষীদের জমি ক্রমে ক্রমে মহাজনদের হাতে চলে গেল। চাষীরা তাদের জমিকে প্রাণের চাইতে বেশী ভালবাসত ; কারণ জমির উপরই তাদের নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদা নির্ভর করত। শুধু ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের জ্বালায় তারা জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল।"[৩]

রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মীয় মৌলবাদের ব্যবহার সামন্ত যুগের মানসিকতার পরিচয় বহন করে। বাঙালিদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কোন বিকাশই সাম্রাজ্যবাদ সহ্য করতে পারে না। তারা মনে করে এসবের বিকাশ মানেই মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া, মেধা ও বুদ্ধির উৎকর্ষ ঘটা। বাঙালি মানসিকতা ও মননের এমন পরিচয় পাকিস্তানকে ভেতরে ভেতরে সতর্ক করে দেয় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে। যার ফলে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালে নানাবিধ রাজনৈতিক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার সমাজ জীবন হয়ে হঠে বিভিন্ন ভাবে বিপর্যস্ত। "দেশ বিভাগের সময়কাল থেকেই বাংলাদেশের সর্বত্র খাদ্য সংকট দেখা দেয়; এই সংকট ১৯৪৯ সালের দিকে ব্যাপক অঞ্চলে বিস্তৃত হয় এবং ১৯৫১ সালে পুনরায় তা দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, খাজনার নির্যাতন প্রভৃতি দুর্বিষহ করে তোলে জনজীবনকে। ... বস্ত্র, কেরোসিন, ভোজ্যতেল প্রভৃতির মূল্যবৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতা জনগণের সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনকে করে তোলে বিপর্যস্ত। এর ফলে কৃষক-জনতা পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকারের গণবিরোধী চরিত্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে এবং তাদের মধ্যে একটা আন্দোলনের সম্ভবনা দেখা দেয়।"[৪]

১৯৫০ সালে একদিকে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অন্যদিকে মন্বন্তরের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি পূর্ববাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে । এ সময়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের দেশত্যাগ ছিল সামাজিক ভাবে বিরাট আঘাত, যা পরবর্তীতে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়েছিল । পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ববাংলায় সার্বিকভাবে একটা সাংস্কৃতিক অবদমন ঘটাতে চেয়েছিল। কিন্তু এই সাংস্কৃতিক অবদমনের মূল অভিসন্ধি ছিল বাঙালিদের অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিকভাবে আধিপত্য বিস্তার করা। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ধারণায় সাম্প্রদায়িক মানসিকতা নিয়ে পাকিস্তানের অগ্রসর ভূমিকা ছিল সত্যিকার অর্থে নিন্দনীয়। দেশভাগের ফলে শেকড়চ্যুত মানুষের মর্মস্পর্শী যন্ত্রণা যখন অন্যতম সামাজিক সমস্যা ঠিক তখনই যেন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মানুষের উপর 'রাষ্ট্রভাষা উর্দু'র বোঝা চাপিয়ে দিল। মূলত এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেশ বিভাগের মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম হয়েছিল। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এই বছরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে ছাত্রসমাজ জিন্নাহ্‌র বিরোধিতা করে। পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রে এদেশের বুদ্ধিজীবীরা বিভ্রান্ত হয় পড়েন। কারণ "১৯৪৭ সাল থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য যে সংগ্রাম শুরু করেন তার সাথে তাদের ভাষাগত আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রশ্নটি প্রথম থেকেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে পাকিস্তানভূক্ত অঞ্চলের মধ্যে বিশেষত পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই অঞ্চলের মধ্যে যে পার্থক্য ১৯৪৭ সালে এবং তার পরবর্তী পর্যায়েও বিরাজ করতে থাকে তার ফল, একদিকে উর্দূকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা বাংলাভাষী জনগণের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ও বিরোধিতাকে ক্রমশ তীব্র করে তুললেও পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসকারী ভাষাভাষী অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ জনগণ উর্দুকেই ধর্মীয় ভাষারূপে মোটামুটি স্বীকার করে নেন।"[৫] ছাত্রসমাজ এ ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। তারা মিটিং-মিছিল, সভা-সমাবেশের মাধ্যমে তাদের প্রতিবাদ অব্যাহত রাখে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের স্বপক্ষে তখন বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হতে থাকে। কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষকসহ বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের স্ব স্ব স্থান থেকে প্রতিবাদ করেন।

"৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ তারিখে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবিতে ২১ শে ফেব্রুয়ারি প্রদেশ ব্যাপী এক সাধারণ ধর্মঘটের আহবান জানানো হয়। গণশক্তির ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে একমাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ধর্মঘট, সভা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা ঘোষনা করে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দ্বিধান্বিত মনোভাব এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জাগ্রত ছাত্র সমাজ সুদৃঢ় আত্মসচেতনতায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে সংহত অভিমত ঘোষনা করে। গ্রেফতার এবং নির্যাতন সত্ত্বেও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্রদের শ্লোগানমুখর বিক্ষুব্ধ মিছিল অগ্রসর হতে থাকলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য পুলিশ ছাত্র মিছিলে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই শহীদ হন আব্দুল জব্বার ও রফিক উদ্দিন আহমদ। গুরুতরভাবে আহত হন ১৭ জন। হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় তাদেরকে। তাদের মধ্যে আবুল বরকত মৃত্যুবরণ করেন রাত আটটায়।"[৬] ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বরকত, সালাম, রফিক, জব্বারের আত্মদান এবং এর

Dhaka University Institutional Repository

ফলশ্রুতিতে পূর্ববাংলায় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা স্বীকৃতি অর্জন করে। "পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন শুধু রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন ও শিক্ষার মাধ্যমের আন্দোলন ছিলনা। সামগ্রিক ভাবে তা ছিল আমাদের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের যথাযথ বিকাশের সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামে সর্বক্ষেত্রে বাংলাভাষাকে ব্যবহারের অধিকার ও স্বাধীনতার সংগ্রাম "[৭]

বিভিন্ন রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যদিয়ে এরপর ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয় এবং যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। যুক্তফ্রন্টের এই বিপুল বিজয় মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ ও পশ্চিম পাকিস্তানি কায়েমী স্বার্থবাদীদের কেবল মোহমুক্তিই ঘটায়নি তাদের ভীত-সন্ত্রস্তও করে তোলে। এরই মাঝে বাঙালির গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা হুমকির মুখে পড়ে। পূর্ববাংলার এই নির্বাচনী ফলাফলকে পাকিস্তান সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের চক্রান্ত বলে ধারণা করে ১৯৫৮ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল করে আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সামরিক শাসন জারি করে। আইয়ুব খানের নেতৃত্বাধীন এই সামরিক শাসন ৬০ দশক জুড়েই অব্যাহত ছিল। এভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। তখন পূর্ব বাংলার মানুষ হৃদয়ঙ্গম করে যে, পাকিস্তানের সঙ্গে থেকে বাংলার মানুষের সার্বিক মুক্তি সম্ভব নয়। ফলে সেই সময় রাজনীতির একটি প্রগতিশীল ধারার সূচনা হয়। ১৯৫৫ সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' আওয়ামী লীগে রূপান্তরিত হয়। আইয়ুব খানের স্বৈরশাসন ১৯৬৯ সালের মার্চ পর্যন্ত ক্রিয়াশীল ছিল।

১৯৬৬ সাল বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের এক অবিস্মরণীয় বছর । নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবর রহমান ঘোষিত ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সুচনা করে এ বছরের ৭ জুন। "১৯৬৬ সালের ১৩ মে আওয়ামী লীগ আয়োজিত পল্টনের এক জনসভায় ৭ জুন হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। জুন মাসব্যাপী ছয় দফা প্রচারে বিপুল কর্মসূচী নেওয়া হয়। ৭ জুন তেজঁগাওয়ের বেঙ্গল বেভারেজের শ্রমিক সিলেটের মনুমিয়া গুলিতে প্রাণ হারান। নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে মারা যান ছয় জন শ্রমিক। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সন্ধ্যায় কারফিউ জারি করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক সম্মেলনে ছয় দফা প্রস্তাব দেন, যা মূলত ছিল বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি, ৬ দফা উপেক্ষিত হওয়ায় আন্দোলন দ্রুতই স্বাধীনতার দাবিতে রূপ নেয়।"[৮] এরই প্রেক্ষিতে "১৯৬৬ সালের ৭ জুন আওয়ামী লীগের আহবানে সমগ্র পূর্ববাংলা ব্যাপী হরতাল পালনকালে সরকারের নৃশংসতা প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী প্রেসনোটে ঢাকায় নিহতের সংখ্যা ৪ এবং নারায়ণগঞ্জে নিহতের সংখ্যা ৬ ও আহত ১৩ জনের উল্লেখ করা হয়।"[৯]

পাকিস্তান সরকারের বাংলাভাষা ও রবীন্দ্র বিরোধী মনোভাব পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে। কারণ এ সময়ে রাষ্ট্রীয় ভাবে রবীন্দ্রনাথ ও পশ্চিম বাংলার অন্যান্য প্রগতিশীল সাহিত্যকদের প্রতি নিন্দাজ্ঞাপনের নীতি গ্রহণ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করে পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলসমূহ এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা। বাঙালি মধ্যবিত্ত সচেতন শ্রেণী এ পর্যায়ে অনেক বেশি পরিণত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। বাঙালির শত বছরের ঐতিহ্য লালিত অসাম্প্রদায়িক জীবনাদর্শ বিভিন্ন অপশাসনের বিরুদ্ধে জাগ্রত হয়ে, এভাবেই রুখে দাঁড়ায় নবজাগরণের বীজমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে।

১৯৬৭-'৬৮ সালে সরকারের পক্ষ থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা রুজু হলে দেশ ব্যাপী আন্দোলন হয় এবং ১৯৬৯ সালে ছাত্রদের ১১ দফা দাবী ও আন্দোলনের ফলে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' থেকে শেখ মুজিব মুক্তি পান। "১৫ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ তারিখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ সামসুদ্দোহা সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হওয়ার সংবাদ ঢাকায় প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সান্ধ্য আইন অগ্রাহ্য করে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে পড়ে। সরকার গণ-জাগরণের প্রচণ্ডতায় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেয় এবং শেখ মুজিবুর সহ সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দান করে।"[১০] তারপরও শেষ রক্ষা হয় না। ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে পূর্ব বাংলায় উত্তাল অস্থির পরিস্থিতি আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করে। স্বাধিকারের দাবিতে সাধারণ মানুষ তখন রাজপথে বিক্ষোভে, মিছিলে সমাবেশে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় নিরুপায় হয়ে আইয়ুব খান তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নজিরবিহীন নির্বাচনী সাফল্য ঘটে। আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ শে মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিবর রহমান ও মওলানা ভাসানীর আহূত ঐতিহাসিক অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখা যায়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার স্বাধীনতার ডাক দেয়া হয়। পরবর্তী ইতিহাস আমরা

Dhaka University Institutional Repository

সবাই জানি। ১৯৭১ সালেল ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর জনগণ ক্রমেই আন্দোলনমুখর ও উত্তাল হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর পৈশাচিক মনোভাব নিয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটায়। ইতিহাসের ভয়াবহ গণহত্যার সূচনা হয় এই রাতেই। এরই ধারাবাহিকতায় সৃষ্টি হয় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের করুণ কাহিনী। ন'মাস ব্যপী মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর হাতে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়, সারা বিশ্বে প্রচারিত হয় এই বর্বর গণহত্যার কথা। প্রসঙ্গক্রমে ১৯৭১ সালে নরওয়ে থেকে প্রকাশিত 'দ্যাগ ব্লাদেত' পত্রিকার উদ্ধিতি দেয়া যেতে পারে। "পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর যে আঘাত করা হয়েছে, তার ব্যাপ্তি যে কত বিশাল পৃথিবী তা এখনও বুঝে উঠতে পারেনি। বছরের শেষ নাগাদ এককোটি মানুষ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে। স্বল্প সময়ের মধ্যে সাহায্য পাওয়া না গেলে এক লাখ শিশু মৃত্যু ঝুকিতে পড়বে। পশ্চিম বঙ্গ শরণার্থী শিবিরে মাত্র এক লাখ লোক ঠাঁই পেয়েছে। এই রাজ্যে শরণার্থী এসেছে ৫০ লাখ। তার মানে ২০ লাখ শরণার্থী গ্রাম ও শহরাঞ্চলের রাস্তার উপর অথবা যেখানে ঠাঁই পাওয়া যায় সেখানেই পড়ে আছে। ক্ষুধা ছাড়াও এখন কলেরা চলছে। এই মহামারীর প্রকোপ কিছুটা কমিয়ে আনা সম্ভব হলেও ভয়ংকর হুমকির মুখে যে একলাখ শিশু রয়েছে তারা ছাড়াও তিন লাখ তীব্র অপুস্টিতে ভুগছে। এই সংখ্যার ভেতরেই লুকিয়ে আছে পূর্ব-পাকিস্তানের ট্রাজেডি স্বরূপ যা বাইরের মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।"[১১] পাকিস্তানি বাহিনীর নির্বিচার হত্যাকাণ্ডে, বেপরোয়া গোলাগুলি ও অগ্নি সংযোগের মুখে রাজনৈতিক নেতাকর্মী এবং সশস্ত্রবাহিনীর বিদ্রোহী বাঙালিরা তো বটেই, বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষও নিরাপত্তার সন্ধানের শহর থেকে গ্রামে এবং গ্রাম থেকে সীমান্তপেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে শুরু করে। ... এমনি ভাবে পাকিস্তানের আঞ্চলিক বিরোধ ও গৃহযুদ্ধের সাথে ভারত ক্রমশ জড়িত হয়ে পড়ে এই ভীত সন্ত্রস্ত শরণার্থীদের জোয়ারে।"[১২] বাংলাদেশে এমন কোন পরিবার খুঁজে পাওয়া যাবে না যারা কোন না কোন ভাবে মুক্তিযুদ্ধের সাথে যুক্ত ছিল না। নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর বাঙালি অর্জন করে প্রিয় স্বাধীনতা। "ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল হর্ষোৎফুল্ল জনতার উপস্থিতিতে ভারত বাংলাদেশ মিলিতিবাহিনীর কাছে পাকিস্তানের সমরাধিনায়ক লেঃ জেনারেল নিয়াজি 'বাংলাদেশে অবস্থিত' সকল পাকিস্তানী বাহিনীর পক্ষে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন।"[১৩] এভাবেই বাঙালি তার নিজস্ব পরিচয়ে স্বতন্ত্র পতাকা নিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে নিজেদের স্থান করে নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

এগুলি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই আন্দোলন প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার প্রগতিশীল উপন্যাসের চালচিত্র রচিত হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ কখনোই একটি অবিচ্ছিন্ন ধারায় অগ্রসর হয়নি। ব্যক্তিগত গোষ্ঠী, শ্রেণী-স্বার্থ ইত্যাদির ফলে প্রশাসন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি নৃশংস হত্যাযজ্ঞের ফলে ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন গোষ্ঠী বৃহত্তর সমাজ জীবনে নবচেতনা নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এ সময়ে শিল্পী সাহিত্যিকরাও যেন রাজনীতি ও সংস্কৃতির মধ্যে এক নতুন যোগসূত্র খুঁজে পান এবং আর্থ-সামাজিক মুক্তির প্রত্যয়ে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ধারা সূচিত করেন। পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বাঙালির গণতান্ত্রিক আন্দোলন এক নতুন মাত্রা পায়। তাঁরা পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে উপাদান সংগ্রহ করে তাঁদের সময়কে সাহিত্যের মাধ্যমে শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করেন। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উল্লেখিত জটিলতাই নিরূপণ করেছে বাংলা উপন্যাসের চেতনাবাহী পটভূমি। তাই সময়, সমাজ জীবনের নানাবিধ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করার ফলে এ পর্যায়ের রচিত উপন্যাস হয়েছে তাৎপর্যমণ্ডিত ও স্বতন্ত্র।

১৯৪৭-১৯৭১সাল পর্যন্ত আমাদের দেশের রাজনৈতিক পালাবদলের সাথে সাথে সাহিত্য ও শিল্পে তার প্রভাবে পরিবর্তনের দোলা লাগে। তৎকালীন কবি, সাহিত্যিকদের আত্ম-উপলব্ধিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশ বিভাগ, ভাষা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি তাঁদের রচিত উপন্যাস, কবিতা, গল্প প্রভৃতির মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যে সকল ঔপন্যাসিক তাঁদের স্বীয় প্রতিভায় বাংলাদেশের উপন্যাসের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আবুল ফজল, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, শওকত ওসমান, আবু ইসহাক, রশীদ করিম, সরদার জয়েনউদ্দীন, আলাউদ্দীন আল আজাদ, শহীদুল্লা কায়সার, জহির রায়হান, সত্যেন সেন, সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই বিদগ্ধ লেখকদের হাত ধরে বাংলাদেশের উপন্যাসে সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক কিভাবে উন্মোচিত হয়েছে, জীবনের স্বরূপ-প্রকৃতিই বা তাঁরা কিভাবে উদঘাটন করেছেন তার ও পর আলোকপাত করা হয়েছে এ গবেষণাপত্রে। উপন্যাসে বিধৃত 'জনজীবন' বলতে প্রধানত গ্রাম-নগরের কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, মধ্যস্বত্বভোগী, বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তিজীবী, চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন শ্রেণীর মানুষের জীবনকেই বোঝানো হয়েছে। এ সময়ে রচিত বেশিরভাগ উপন্যাসই গ্রামবাংলার কাহিনী

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান। সেই সাথে নগর জীবন সম্পর্কিত অনেক অনুভূতিপ্রবণ উপন্যাসও রচিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রভাব ঔপন্যাসিকদের মানসিকতায় গ্রাম-নগর জীবনের দ্বান্দ্বিক রূপটিই ফুটে উঠেছে। তাঁরা নিজেদের জীবনাভিজ্ঞতাকে উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন তাঁদের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে।

কথাসাহিত্যের সচেতন লেখকবৃন্দ চব্বিশ বছরের (১৯৪৭-১৯৭১) বাংলাদেশের প্রকৃত আর্থ- সামাজিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে জনজীবনকে কিভাবে বিন্যস্ত করেছেন তাঁদের সৃষ্টিতে, সেসব বিষয় পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হবে। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রধান প্রধান উপন্যাসগুলি অবলম্বন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. আনু মুহাম্মদ '৬০ দশক : রাষ্ট্র, রাজনীতি ও মানুষ', নিসর্গ, শিল্প সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা, বর্ষ-২২, সংখ্যা-১, ষাটের দশক সংখ্যা, পৃ. ১৩-১৪।

২. রেহমান সোবহান, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম,ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ. ৬২৪।

৩. বশীর আল হেলাল, 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস', আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৪০-৪১।

৪. 'বাংলাদেশের উপন্যাস ঃ বিষয় ও শিল্পরূপ', রফিকউল্লাহ খান, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন-১৯৯৭, পৃ. ৪৫।

৫. 'ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', বদরুদ্দীন উমর, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ-১৯৭৮, পৃ. ১৪-১৫।

৬. বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২

৭. ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

৮. দৈনিক প্রথম আলো, ৭ জুন-২০১০, সম্পাদক : মতিউর রহমান, সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা, পৃ. ২১।

৯. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিল, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদক-হাসান হাফিজুর রহমান, ১৯৮২, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ২৭০।

১০. বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০-১১১।

১১. 'দ্যাগ ব্লাদেত' নরওয়ে থেকে প্রকাশিত পত্রিকা, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ এ প্রকাশিত। সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, প্রাগুক্ত, ২৩ মার্চ ২০১০, পৃ. ১।

১২. 'মূলধারা : ৭১', মাঈদুল হাসান, ১৯৮৬, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ. ৫।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬-২৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রধান প্রধান ঔপন্যাসিকের জীবনবৃত্তান্ত ও সাহিত্যকর্ম

আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)

কথা সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ আবুল ফজলের জন্ম ১৯০৩ সালের ১লা জুলাই চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার অন্তর্গত কেঁওচিয়া গ্রামে। মসজিদের ইমাম পিতা মৌলবি ফজলুর রহমানের তত্ত্বাবধানে আবুল ফজলের শিক্ষাজীবন শুরু হয় মাদ্রাসায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯২৮ সাল বি.এ, ১৯৩১ সালে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ হতে বি.টি. এবং ১৯৪০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি প্রথমে মসজিদের ইমাম হিসেবে চাকরি জীবন শুরু করেন ; ১৯৪১ সালে পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর কলেজে বাংলা বিষয়ের লেকচারার হিসেবে যোগ দেন। তিনি ১৯৪৩ সালে চট্টগ্রাম কলেজে বদলি হন এবং ১৯৫৬ সালে সেখান থেকেই অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। স্বাধীন দেশে ১৯৭৩ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে ১৯৭৫ সালের নভেম্বর যোগদান করেন এবং ১৯৭৭ সালের ২৩শে জুন তিনি এই পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত অবস্থায় ১৯২৩ সালে তিনি মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং ১৯৩০ সালে এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। মুসলিম সাহিত্য সমাজের মূল নেতৃত্বে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আবুল হুসেন।

"জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট', মুক্তি সেখানে অসম্ভব"- এই মূলমন্ত্র নিয়ে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের উদ্দেশ্য ছিলো সামাজিক কুসংস্কার ও অন্ধশাস্ত্রানুগত্য থেকে মানুষকে মুক্ত করা। "এই উদ্দেশ্যে তাঁরা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁদের সেই আন্দোলনের বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য ১৯২৬ সালে তাঁরা প্রকাশ করেন সমাজের মুখপত্র 'শিখা'। মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও শিখার সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁরা 'শিখাগোষ্ঠী' নামে পরিচিত ছিলেন।"[১] "শিখাগোষ্ঠীর এই আন্দোলনের মাধ্যমে আবুল ফজল যে মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর রচনায় সেই প্রতিফলন ঘটে । তিনি সমাজ ও যুগসচেতন লেখক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। কথাশিল্পী হিসেবেও

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। স্বদেশপ্রেম, অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা, সত্যনিষ্ঠা, মানবতা ও কল্যাণবোধ ছিল তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রতিপাদ্য বিষয়।"[২]

উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, আত্মকথা, ধর্ম, ভ্রমণকাহিনী সহ সাহিত্যেও সর্বত্র ছিল তাঁর সদর্প পদচারণা। তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

উপন্যাস : চৌচির (১৯৩৪), প্রদীপ ও পতঙ্গ (১৯৪০), রাঙ্গা প্রভাত (১৯৫৭), ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪)

গল্পগ্রন্থ : মাটির পৃথিবী (১৯৪০), মৃতের আত্মহত্যা (১৯৭৮)

প্রবন্ধ : সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা (১৯৬১), সাহিত্য,সংস্কৃতি ও জীবন (১৯৬৫), সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র (১৯৬৮), মানবতন্ত্র (১৯৭২) ।

আত্মকাহিনী ও দিনলিপি: রেখাচিত্র (১৯৬৬), দুর্দিনের দিনলিপি (১৯৭২) ইত্যাদি।

এই সমাজ ও সমকাল সচেতন সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যকীর্তির জন্য বহু পুরস্কারে ভূষিত হন। তার মধ্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২), প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৩), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৬), নাসিরুদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৮০), মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১), আবদুল হাই সাহিত্য পদক (১৯৮২) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মাসূচক "ডক্টরেট অব লিটারেচারে" ভূষিত করে।

প্রগতিবাদী এই বুদ্ধিজীবী ১৯৮৩ সালের ৪ঠা মে, ৭৯ বছর বয়সে চট্টগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন।

সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১)

বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার অন্যতম পথিকৃৎ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ সত্যেন সেনের জন্ম ১৯০৭ সালের ২৮ মে মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গিবাড়ি উপজেলার সোনারঙ গ্রামে। "তাঁর পিতৃব্য ক্ষিতিমোহন সেন ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব আচার্য্য।"[৩]

Dhaka University Institutional Repository

সোনারঙ হাইস্কুল হতে ১৯২৪ সালে এন্ট্রান্স পাস করে তিনি কলকাতা চলে যান। "সেখানকার একটি কলেজ হতে এফ.এ. ও বি.এ.পাস করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ.(ইতিহাস) শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু যুগান্তর দলের সদস্য হিসেবে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে তিনি ১৯৩১ সালে গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন এবং জেলে থেকেই বাংলা সাহিত্যে এম.এ. পাস করেন। জেল থেকে মুক্তিলাভের (১৯৩৮) পর বিক্রমপুরে ফিরে তিনি কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন এবং আমৃত্যু বামপন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা নির্বাচিত হন। সত্যেন সেন ১৯৪৯, ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬৫ সালেও রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার হয়ে বিভিন্ন মেয়াদে কারাভোগ করেন।"[৪]

সত্যেন সেন পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন সাংবাদিকতাকে। ১৯৫৪ সালে 'দৈনিক সংবাদ'- এ সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূচনা হয়। "এদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে সত্যেন সেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সংগঠক এবং উদীচী (১৯৬৯) সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন রবীন্দ্র সঙ্গীত ও গণসঙ্গীতের সুকণ্ঠ গায়ক এবং গণসঙ্গীত রচয়িতা।"[৫] পরিণত বয়সে সাহিত্যচর্চা শুরু করে সত্যেন সেন মাত্র দুই দশকে প্রায় ৪০টি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রগতিশীল ও গণমুখী চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ এই সাহিত্যিকের রচনায় ঐতিহ্য, ইতিহাস, দেশের মাটি ও মানুষের শ্রেণী- সংগ্রাম প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হলো-

উপন্যাস : ভোরের বিহঙ্গী (১৯৫৯), অভিশপ্ত নগরী (১৯৬৭), পদচিহ্ন (১৯৬৮), পাপের সন্তান (১৯৬৯), কুমারজীব (১৯৬৯), বিদ্রোহী কৈবর্ত (১৯৬৯), পুরুষমেধ (১৯৬৯), আলবেরুনী (১৯৬৯), মা (১৯৬৯), অপরাজেয় (১৯৭০), উত্তরণ (১৯৭০), সাত নম্বর ওয়ার্ড (১৯৬৯), সেয়ানা (১৯৬৮), রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ (১৯৭৩)।

শিশু সাহিত্য : পাতাবাহার (১৯৬৭),অভিযাত্রী (১৯৬৯)।

ইতিহাস গ্রন্থ : মহাবিদ্রোহের কাহিনী (১৯৫৮), বাংলাদেশের কৃষক সংগ্রাম (১৯৭৬), মানবসভ্যতার উষালগ্নে (১৯৬৯), ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা (১৯৮৬)।

বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ : আমাদের এই পৃথিবী (১৯৬৭),এটমের কথা (১৯৬৯)।

জীবনী : মনোরমা মাসীমা (১৯৭০), সীমান্ত সূর্য আবদুল গাফফার খান (১৯৭৬) ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাস সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য এই সংগ্রামী সাহিত্যিক ১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি ১৯৮১ সালের ৫ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে মৃত্যুবরণ করেন।

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)

বাংলাদেশর কথাশিল্পের সমৃদ্ধির প্রসঙ্গ এলেই যে নামটি অনিবার্যভাবে চলে আসে তিনি শওকত ওসমান। একজন প্রকৃত কথাসাহিত্যিক, আধুনিক উপন্যাসের সার্থক রূপকার। শওকত ওসমানের জন্ম ১৯১৭ সালের ২রা জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের সবল সিংহপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ইয়াহিয়া ও মাতার নাম গুলজান বেগম। শওকত ওসমান লেখকের ছদ্মনাম। তাঁর প্রকৃত নাম শেখ আজিজুর রহমান।

শওকত ওসমানের শিক্ষাজীবন শুরু হয় সবল সিংহপুর গ্রামের মক্তবে। তিনি ১৯৩৩ সালে কলকাতা মাদ্রাসা-এ আলিয়ার ইংরেজি শাখা থেকে ১ম বিভাগ পেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ১৯৩৬ সালে আই.এ. এবং ১৯৩৯ সালে বি.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.এ পাস করেন।

শওকত ওসমানের কৈশোর কেটেছে চরম অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে। মাদ্রাসায় পড়ার সময় তিনি টিউশনি করে সংসারে টাকা পাঠাতেন। তাঁর রচিত 'স্বগ্রাম স্বজন' বইতে তিনি বাল্যকালের দারিদ্র্যের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। ছাত্রাবস্থায় ১৯৩৮ সালে তিনি বিয়ে করেন। তার স্ত্রীর নাম সালেহা খাতুন। শওকত ওসমান পাঁচ ছেলে, এক মেয়ের জনক ছিলেন।

আমৃত্যু তিনি ছিলেন প্রগতিশীল ধারার সফল সৃষ্টিশীল লেখক। মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি লিখতেন যা তাঁর সমাজমনস্ক সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির শ্রেষ্ঠ প্রতিফলন। স্বৈরতন্ত্র ও ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার কণ্ঠ।

"শওকত ওসমানকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিল 'জননী' (১৯৬১) এবং 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬৩) উপন্যাসদ্বয়। নির্মম দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করা চাষী পরিবারের সন্তান শওকত ওসমান তাঁর 'জননী' উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজের দরিদ্র পরিবারের জীবন্ত ছবি একেঁছেন। তাঁর প্রথম সার্থক উপন্যাস জননীতে- জীবন উপলব্ধি ও মানবীয় চেতনার সফল সমন্বয় ঘটেছে। জীবনকে তিনি দেখেছেন বহু কৌণিক

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টি দিয়ে। তবে 'ক্রীতদাসের হাসি' শওকত ওসমানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রেরণাদায়ী এই উপন্যাসে খলিফা হারুনুর রশীদকে আইয়ুব খানের আদলে মূর্ত করেছেন।"[৬]

সময় ও সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী এ দুটি উপন্যাস একজন দেশপ্রেমিক লেখকের শ্রেষ্ঠ চিন্তার ফসল। মূলত সমাজ ও রাষ্ট্রের অসঙ্গতি, মানুষের ভণ্ডামি এবং মৌলবাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক এই দুটি গৌরবময় উপন্যাস তাঁকে এনে দিয়েছে সাফল্যের মুকুট।

"উপন্যাস ও গল্প রচয়িতা হিসেবেই শওকত ওসমানের মুখ্য পরিচয় ; তবে প্রবন্ধ, নাটক, রম্যরচনা, স্মৃতিকথা ও শিশুতোষ গ্রন্থ ও তিনি রচনা করেছেন। বিদেশী ভাষার অনেক উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটক তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। গ্রন্থসম্পাদনের ক্ষেত্রেও তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা হলো –

উপন্যাস : জননী (১৯৫৮), ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২), সমাগম (১৯৬৭), চৌরসন্ধি (১৯৬৮), রাজা উপাখ্যান (১৯৭১), জাহান্নাম হইতে বিদায় (১৯৭১), দুই সৈনিক (১৯৭৩), নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩), পতঙ্গ পিঞ্জর (১৯৮৩), আর্তনাদ (১৯৮৫), রাজপুরুষ (১৯৯২)।

গল্প গ্রন্থ : জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প (১৯৫২), মনিব ও তাহার কুকুর (১৯৮৬), ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী (১৯৯০)।

প্রবন্ধগ্রন্থ : ভাব ভাষা ভাবনা (১৯৭৪), সংস্কৃতির চড়াই-উৎরাই (১৯৮৫), মুসলিম মানসের রূপান্তর (১৯৮৬)।

নাটক : আমলার মামলা (১৯৪৯), পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা (১৯৯০)।

শিশুতোষ গ্রন্থ : ওটেন সাহেবের বাংলো (১৯৪৪), মস্কুটোফোন (১৯৫৭), ক্ষুদে সোশালিস্ট (১৯৭৩), পঞ্চসংগী।

রাজনীতিতে সক্রিয় না হলেও রাজনৈতিক মতামত প্রকাশে স্পষ্টভাষী এই কথাসাহিত্যিক সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। এর মধ্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৬). পাকিস্তান সরকারের প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (১৯৬৭), একুশে পদক (১৯৮৩), মাহবুবউল্লাহ ফাউন্ডেশন পুরস্কার (১৯৮৩), মুক্তধারা সাহিত্য পরস্কার (১৯৯১), স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (১৯৯৭) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যের এই অনন্য কথাশিল্পী ১৯৯৮ সালের ১৪মে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাঁর বিপুল সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে অমর হয়ে থাকবেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১)

বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার ছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। তাঁর জন্ম ১৯২২ সালের ১৫ই আগস্ট চট্টগ্রামের ষোলশহরে। পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহর সরকারি চাকরীর সুবাদে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখার এবং সেসব অঞ্চলের জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন, পরবর্তীতে যা তাঁর উপন্যাস ও নাটকের চরিত্র নির্মাণ ও জীবন অন্বেষণে প্রভূত সাহায্য করে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কুড়িগ্রাম হাইস্কুল হতে ১৯৩৯ সালে ম্যাট্রিক, ১৯৪১ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হতে আই.এ. ও ১৯৪৩ সালে আনন্দমোহন কলেজ হতে ডিস্টিংকশনসহ বি.এ. পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম.এ. শ্রেণীতে ভর্তি হলেও শেষ করেননি। কলকাতার তৎকালীন বিখ্যাত দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার সাব-এডিটর হিসেবে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। "১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ঢাকায় এসে প্রথমে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সহকারী বার্তা সম্পাদক ও পরে করাচী কেন্দ্রের বার্তা সম্পাদক (১৯৫০-৫১) হন। ১৯৫১-৬০ পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান সরকারের পক্ষে নয়াদিল্লি ,সিডনি, জাকার্তা ও লন্ডনে উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬০-৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি প্যারিস, পাকিস্তান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী এবং ১৯৬৭-৭১ সাল পর্যন্ত ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ছিলেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারকার্য চালান এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সংগে ফরাসী একাডেমীর সদস্য পিয়ের এমানুয়েল আঁদ্রে মারলো প্রমুখ বুদ্ধিজীবীর সহযোগিতায় বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।"[৮] তিনি ফরাসি মহিলা এ্যান মেরির পাণি গ্রহণ করে।

"হাইস্কুলের ছাত্র থাকাকালেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হয়। এ সময় তিনি হাতে লেখা পত্রিকা 'ভোরের আলো' সম্পাদনা করেন। তার প্রথম গল্প 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'-ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। "[৯] সওগাত, বুলবুল, মোহাম্মদী, পরিচয়, পূর্বাশা প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতো।

Dhaka University Institutional Repository

"বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের লেখক-বুদ্ধিজীবীরা রাজনৈতিক আলোড়নে যখন নানাভাবে আলোড়িত, তখন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলার গ্রাম ও সমাজ জীবনের এক ধ্রুপদী জীবনধারাকে 'লালসালু' উপন্যাসে রূপদান করেন। তিনি এতে বাংলার লোকায়েত সংস্কার ও ধর্মাচরণের নেপথ্যে তথাকথিত ধর্মধ্বজাধারী ও ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ীদের স্বরূপ গভীর জীবনবোধ ও মমত্বের সঙ্গে প্রকাশ করেন।"[১০] 'লালসালু'র জনপ্রিয়তা অনেক ; ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় তা অনূদিত হয়। এর ফরাসি অনুবাদক তার স্ত্রী এ্যান মেরি।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র উল্লেখযোগ্য রচনা হলো–

উপন্যাস : লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)।

নাটক : বহিপীর (১৯৬৫), সুড়ঙ্গ (১৯৬৪), তরঙ্গ ভঙ্গ (১৯৬৬)।

ছোটগল্প : নয়নচারা (১৯৫১), দুই তীর ও অন্যান্য গল্প (১৯৬৫) ইত্যাদি।

মাত্র তিনটি উপন্যাস লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছেন। তাঁর কাহিনীতে নতুন রীতি বা মাত্রা যোগ করেছিল ইউরোপীয় আধুনিকতা। প্রগতিশীল মানসিকতায় তিনি গল্পের আঙ্গিক, রচনাকৌশল প্রভৃতিতে আধুনিক মননে শিল্পীত উপস্থাপনা করেন। তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক প্রভৃতির ভেতরে অস্তিত্ববাদের বিষয়টি প্রকট হয়ে ওঠে। 'চেতনাপ্রবাহ রীতি' Stream of consciouness তাঁর সাহিত্যে প্রথম সার্থকভাবে ফুটে ওঠে। জীবন অভিজ্ঞতাকে তিনি সফলভাবে উপস্থাপন করেছেন তাঁর সৃষ্টিতে।

বাঙালি মুসলমানের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পেছনে সত্যিকার চেতনা নির্মাণের দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে যে মূল্যায়ন সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, তা হলো তিনি বাংলাদেশের লেখক। বাংলা ভাষার হাজার বছরের ধারাক্রমে বিশ শতকের চল্লিশের দশকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ই প্রথম বাংলা কথাসাহিত্যের উপকরণ, বিষয় ও শিল্পরীতির চরিত্র কি হতে পারে তার স্বরূপ নির্দেশ করেন। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জীবন রূপায়ণের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল থেকেই একটা অপূর্ণতা ছিল। তা হচ্ছে মুসলিম জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বসত্তার রূপায়ণ। বাঙালি মুসলমানের জীবন নিয়ে দেশবিভাগের আগেও অনেক উপন্যাস রচিত হয়েছে। কিন্তু বিশ্বমানের জীবন জিজ্ঞাসা ও শিল্পরূপ সেগুলোতে অনুপস্থিত। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রথম নির্দেশ করেন বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারা, বাংলাদেশের উপন্যাসের সংলাপের ধরন কী এবং মধ্যবিত্তের অবচেতনাকে কোন অনিবার্য শব্দ শৃঙ্খলায় উপস্থাপন করতে হবে, তার স্বভাবধর্ম।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪) এবং কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮) ক্রমগ্রসরতার বিষয়বস্তু ও শিল্পরূপের সাম্যবাহী।"[১১]

মননশীলতা ও ভাষার নিটোল বাঁধুনীদানে পারদর্শী এই সাহিত্যিক, তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য নানা পুরষ্কারে ভূষিত হন। এর মধ্যে- বাংলা একাডেমী পুরষ্কার (১৯৬১), আদমজী সাহিত্য পদক (১৯৬৫), একুশে পদক (১৯৮৩) (মরনোত্তর) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৯৭১ সালের ১০ই অক্টোবর প্যারিসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং প্যারিসের উপকণ্ঠে 'মঁদো- স্যুর বেলভু'-তে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

সরদার জয়েনউদ্‌দীন (১৯১৮-১৯৮৬)

সরদার জয়েনউদ্‌দীন বাংলা উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণের এক কুশলী শিল্পী। সাবলীল গদ্যের উপস্থাপনায় মানুষের যাপিত জীবন বর্ণনায় অসাধারণ সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। পঞ্চাশের দশকে ছোটগল্প রচনার মধ্যদিয়ে তাঁর সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্র চিহ্নিত হতে থাকে। পরে উপন্যাসেও তিনি খ্যাতিমান হন। "সরদার জয়েনউদ্‌দীন এর জন্ম ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার নাজিরগঞ্জ ইউনিয়নের চরখাঁপুর গ্রামে। তাঁর রচিত জীবনপঞ্জিতে জন্মাসন ও তারিখ দেওয়া হয়েছে ১লা মার্চ ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে। প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় প্রকৃত বয়স প্রায় পাঁচ বছর কমিয়ে দিয়ে জন্মতারিখ ঠিক করা হয়েছিল।"[১২]

পারিবারিক পদবী সহ তাঁর পুরো নাম মুহম্মদ জয়েনউদ্‌দীন বিশ্বাস। কর্মজীবনে নামের আগে 'সরদার' পদবী জুড়ে দিয়ে নিজের নামকে অনেকাংশে আধুনিক করেন এবং সাহিত্যজীবনে এই নামেই পরিচিত হন। সরদার জয়েনউদ্‌দীনের বাবার নাম তাহের উদ্‌দীন বিশ্বাস ও মায়ের নাম সখিনা খাতুন। তিনি ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে বিয়ে করেন। তার স্ত্রীর নাম রাবেয়া খাতুন। সরদার জয়েনউদ্‌দীনের শিক্ষা জীবন শুরু হয় স্থানীয় মাদ্রাসায়। তিনি ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে খলিলপুর হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। পাবনার এডওয়ার্ড কলেজে আই.এ.তে ভর্তি হলেও পরীক্ষা দেননি। তিনি জুট করপোরেশনে অল্পদিনের জন্য অস্থায়ী এক চাকুরীর মধ্যদিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৯৪১ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ

Dhaka University Institutional Repository

দেন। সেখানে পাঁচ বছর কাজ করার বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি উপন্যাস *অনেক সূর্যের আশা* তে বিবৃত করেছেন। দেশ বিভাগের পর তিনি সেনাবাহিনীর চাকুরী থেকে অব্যাহতি পান। ১৯৪৮ সালে তিনি 'পাকিস্তান অবজার্ভার' পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগের সহকারীরূপে যোগ দেন। পরবর্তীতে তিনি দৈনিক সংবাদ, তৎকালীন পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির দুটি পত্রিকা 'সেতারা' ও 'শাহীন', দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইত্তেহাদ, ইস্টার্ন ফেডারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে চাকুরী করেন। তারপর তিনি যোগ দেন তৎকালীন পাকিস্তান ন্যাশনাল বুক সেন্টারে (পরবর্তীতে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র)। দীর্ঘকাল জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালকরূপে তিনি বাংলাদেশের গ্রন্থ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ডের উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

সমকালের নানা সামাজিক, রাজনৈতিক অভিঘাত ও আলোড়ন তার রচনাকর্মের বিষয় হয়েছে। তাঁর লেখনীতে জীবন অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তিনি তাঁর লেখায় নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা নিম্নে উল্লেখিত হলো-

"উপন্যাস: আদিগন্ত (১৯৫১), পান্নামোতি (১৯৬৪), নীল রং রক্ত (১৯৬৫), অনেক সূর্যের আশা (১৯৬৭) বেগম শেফালী মির্জা (১৯৬৮), শ্রীমতী ক ও খ এবং শ্রীমান তালেব আলী (১৯৪৪), বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ (১৯৭৫), কদম আলীদের বাড়ি।

গল্পগ্রন্থ : নয়ানচুলী (১৯৫২), বীরকণ্ঠীর বিয়ে (১৯৫৫), খরস্রোত (১৯৫৫), অষ্টপ্রহর (১৯৭০), বেলা ব্যানার্জীর প্রেম (১৯৭৩)।

সরদার জয়েনউদ্‌দীন ছিলেন স্পষ্টভাষী এবং ন্যায়ের পক্ষে অনড় ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিজীবনে সহজ স্বভাবের সরদার জয়েনউদ্‌দীন দায়িত্বশীলতা ও কর্মনিষ্ঠায় কোন শৈথিল্য ছিল না।"[১৩] এই সৃষ্টিশীল লেখক তাঁর নানা সাহিত্যকর্মের জন্য বিভিন্ন পদকে ভূষিত হন। এর মধ্যে, বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৭), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৭) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রগতিশীল ও সমাজসচেতন এই লেখক ১৯৮৬ সালের ২২ শে ডিসেম্বর, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে মিরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রশীদ করিম (জন্ম ১৯২৫)

গত চারদশকে যে কয়েকজন ঔপন্যাসিক তাঁদের সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব জায়গা তৈরি করে নিয়েছেন, রশীদ করিম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সফল রূপকার রশীদ করিমের জন্ম ১৯২৫ সালের ১৪ই আগস্ট কলকাতায়। তিনি ১৯৪৮ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ হতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি পেশাগত জীবনে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন।

দেশ বিভাগের পর রশীদ করিমের পরিবার কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসে। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র থাকাবস্থায় তিনি প্রথম গল্প রচনা করেন, যদিও তাঁর প্রথম প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম ছিলো 'আয়েশা'- যা ১৯৪২ সালে তৎকালীন সাহিত্য সাময়িকী 'সওগাত'-এ প্রকাশিত হয়। দেশ বিভাগ, বাস্তুত্যাগ, জীবন-সংগ্রাম ইত্যাদির কারণে তাঁর লেখার কাজ ব্যাহত হয়। দীর্ঘকাল বিরতির পর ১৯৬১ সালে 'উত্তম পুরুষ' উপন্যাস রচনার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়। এই উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি পরিচিতির সাথে সাথে সম্মানজনক 'আদমজী সাহিত্য পুরষ্কারে' ভূষিত হন। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় উপন্যাস 'প্রসন্ন পাষাণ' এর মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ঔপন্যাসিক হিসেবে আবির্ভূত হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী কালে তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকর্ম প্রকাশিত হয়। রশীদ করিম তাঁর উপন্যাসে তৎকালীন কলকাতা ও ঢাকা নগরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনধারা আলোচনা করেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান রশীদ করিম তাঁর উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন ধারা নানা দিক ফুটিয়ে তুলেছেন। "রশীদ করিমের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো -

উপন্যাস : উত্তম পুরুষ (১৯৬১), প্রসন্ন পাষাণ (১৯৬৩), আমার যতো গ্লানি (১৯৭৩), প্রেম একটি লাল গোলাপ (১৯৭৮), একালের রূপকথা (১৯৮০), সাধারণ লোকের কাহিনী (১৯৮২), সোনার পাথরবাটি (১৯৮৪) ইত্যাদি।

গল্পগ্রন্থ : প্রথম প্রেম

প্রবন্ধ : আর এক দৃষ্টিকোন, অতীত হয় নূতন পুনরায়, মনের গহনে তোমার মূর্তিখানি।"[১৪]

বাংলা সাহিত্যের এই আধুনিক ঔপন্যাসিক তার সাহিত্যকর্মের জন্য বিভিন্ন পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছেন। এগুলির মধ্যে- আদমজী সাহিত্য পুরষ্কার (১৯৬৯), বাংলা একাডেমী পুরষ্কার (১৯৭২), একুশে পদক (১৯৮৪), লেখিকা সংঘ পুরষ্কার (১৯৯১) উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

এই প্রথিতযশা, আধুনিকমনস্ক লেখক, এখনো স্বমহিমায় ভাস্কর হয়ে তাঁর সাহিত্যকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। মূলত মুসলমান সাহিত্যিকদের উদার চিন্তাধারার এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। বিভাগোত্তর কালে তিনি এমন এক সাহিত্যিক যিনি ধর্মীয় কুসংস্কারের অন্ধভাব থেকে মুসলমানদের মুক্তির পথ দেখাতে চেয়েছেন এবং সফল হয়েছেন।

শামসুদ্দিন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭)

শামসুদ্দিন আবুল কালাম বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে এক উজ্জ্বল নাম। সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনন্যতা চিহ্নিত হয়েছিল। শামসুদ্দিন আবুল কালাম ১৯২৬ সালের ১লা এপ্রিল বৃহত্তর বরিশালের নলছিটি উপজেলার কামদেবপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম 'আবুল কালাম শামসুদ্দিন' । কিন্তু তৎকালীন 'দৈনিক আজাদ'-র সম্পাদকের একই নামের কারণে বিভ্রান্তি এড়ানো জন্য তিনি ১৯৫৫ সাল থেকে বর্তমান রূপে তাঁর নামের ব্যবহার করেন। শামসুদ্দিন আবুল কালামের বাবার নাম আকরাম আলী মুন্সি ও মায়ের নাম মেহেরুন্নিসা ।

"তিনি ১৯৪১ সালে বরিশাল জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪৩ সালে ব্রজমোহন কলেজ (বি.এল কলেজ) হতে আই.এ এবং ১৯৪৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ পাশ করেন। ষাটের দশকে তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডক্টর অব লিটারেচার (ডি.লিট) উপাধি এবং রোমের 'এক্সপেরিমেন্টল সেন্টার অব সিনেমাটোগ্রাফী' থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পর্কে ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন।

কলেজ জীবনে শামসুদ্দিন আবুল কালাম নিখিল বঙ্গ ছাত্র কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন এবং আর.এস.পি পার্টির সাথে যুক্ত থেকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। দেশভাগের পর ১৯৫০ সালে শামসুদ্দিন আবুল কালাম ঢাকায় এসে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রচার ও তথ্য দপ্তরে সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন। পরে সেখান থেকে প্রকাশিত 'মাহে নও' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন।"[১৪] ১৯৫৬-৫৭ সালে তিনি জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কোর ফেলোসিপ লাভ করেন। ১৯৫৯ সালের পর কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন অবশেষে ইতালীর রোমে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন।"[১৫] ১৯৭১সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুজিবনগর সরকারের পক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের ব্যাপারে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। শামসুদ্দিন আবুল কালাম একজন কথাশিল্পী হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো :

উপন্যাস : আলমনগরের উপকথা (১৯৫৪), কাশবনের কন্যা (১৯৫৪), দুই মহল (১৯৫৫), কাঞ্চনমালা (১৯৫৬), জীবন-কান্ড (১৯৫৬), জায়জঙ্গল (১৯৭৮), সমুদ্রবাসর (১৯৮৬), নবান্ন (১৯৮৭), যার সাথে যার (১৯৮৬), কাঞ্চনগ্রাম (১৯৯৭)

গল্প গ্রন্থ : অনেক দিনের আশা (১৯৫২), ঢেউ (১৯৫৩), পথ জানা নাই (১৯৫৩), দুই হৃদয়ের তীর (১৯৫৫), শাহের বানু (১৯৫৭), দুই ডালিমের কাব্য (১৯৮৭)।

"অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি: সোনারগাঁও, দুমুড়ি সময়, কল্যানীয়াসু, সিরতাকী, ক্ষীর সাগর, পালতোলা নাও, ঢেউ ভরা নদী, সাগর ঠিকানা, কূল-উপকূল, জীবন বহতা, ঈষদাভাস (আত্মজীবনী-১ম খন্ড), এবং 'দি গার্ডেন অব কেইন ফ্রুটস' (ইংরেজি উপন্যাস)।"[১৬] তাঁর রচনায়, গ্রামীণ বাংলার ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। বাংলা কথাসাহিত্যে সমকাল সচেতনতায় তিনি যে নতুন মাত্রা যোগ করেন, তা হলো সুগভীর জীবন জিজ্ঞাসা। অপরূপ শিল্প-কুশলতায় তিনি সে জীবন চিত্রিত করেছেন। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি ১৯৯৪ সালে 'বাংলা একাডেমী' পুরষ্কার লাভ করেন।

১৯৯৭ সালের ১০ই জানুয়ারি রোমে নিজ বাসভবনে মৃত্যুর পর তাঁকে ঢাকায় সমাহিত করা হয়।

আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)

বাংলা সাহিত্যে যেকজন সাহিত্যিক তাঁদের সামান্য কিছু সাহিতকর্মের মধ্য দিয়ে নিজেকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে আবু ইসহাক অন্যতম। বাস্তব জীবনের স্বার্থক রূপকার এই সাহিত্যিক ১৯২৬ সালের ১লা নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানাধীন শিরঙ্গম গ্রামে। মেধাবী ছাত্র আবু ইসহাক ১৯৪২ সালে স্কলারশীপ নিয়ে ম্যাট্রিক এবং ১৯৪৪ সালে আই.এ পাশ করেন। আই.এ.পাশ করার পরপরই তিনি সরকারি চাকরীতে যোগদান করেন। এ কারণে দীর্ঘ ষোল বছর পর তিনি করাচি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৬০ সালে বি.এ. পাশ করেন। সরকারী চাকুরিজীবী হিসেবে আবু ইসহাক দেশে বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে এবং বিদেশে কূটনৈতিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি আকিয়াব ও কলকাতায়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ দূতাবাসের ভাইস কনসাল ও ফার্স্ট সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। ১৯৮৩ সালে তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

আবু ইসহাকের প্রথম মুদ্রিত গল্প 'অভিশাপ' প্রকাশিত হয় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'নবযুগ' (কলকাতা) পত্রিকায়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই 'হারেম' (১৯৬২)। ১৯৪৮ সালে প্রথম উপন্যাস 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' রচনা শেষ করলেও প্রকাশনাগত জটিলতার কারণে এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। ব্যক্তিজীবনে তিনি শহরের বাসিন্দা হলেও তার সৃষ্টিশীলতায় গ্রাম বাংলার ছবি আঁকতে তিনি স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' এবং 'পদ্মার পলিদ্বীপ' এ দুটি সফল উপন্যাসই একথার সাক্ষী। বিশেষত 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' একটি স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি। অনুদিত হয়ে বইটি বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র দুটি আন্তর্জাতিক এবং বিভিন্ন বিভাগে নয়টি জাতীয় পুরস্কার লাভ করে। তাঁর ছোটগল্প গ্রন্থ 'মহাপতঙ্গ' গল্প অবলম্বনে রচিত চিত্রনাট্য সুইজারল্যান্ডে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করে।"[১৭] তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হলো-

উপন্যাস : সূর্য-দীঘল বাড়ী (১৯৫৫), পদ্মার পলিদ্বীপ (১৯৮৬), জাল (১৯৮৮)।

ছোটগল্প : হারেম (১৯৬২), জোঁক, মহাপতঙ্গ।

অভিধানগ্রন্থ : সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান (বাংলা একাডেমী)।

সাহিত্য সাধনায় স্বীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই সাহিত্যিক উপন্যাস সাহিত্যের বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কারে ভূষিত হন। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে, সুন্দরবন সাহিত্য পদক (১৯৮১), একুশে পদক (১৯৯৭),স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (২০০৪ মরনোত্তর) অন্যতম।
বাংলা সাহিত্যের এই মহান শিল্পী ২০০৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১)

১৯২৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কথাসাহিত্যিক, লেখক ও সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সার। প্রকৃত নাম আবু নাঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লা হলেও শহীদুল্লা কায়সার নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। কলকাতা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অধ্যাপক (পড়ে ঢাকা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অধ্যক্ষ)

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ তাঁর পিতা। প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও লেখক জহির রায়হান তাঁর অনুজ। ১৯৫৮ সালে শহীদুল্লাহ পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ডাক্তার আর আহমদের কন্যা কমিউনিস্ট কর্মী জোহরা খাতুনকে বিবাহ করেন। পরে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটলে ১৯৬৯ সালে তিনি পান্না চৌধুরী ওরফে পান্না কায়সারকে বিবাহ করেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত টিভি অভিনেত্রী শমী কায়সার তাঁর সুযোগ্যা কন্যা।

শহীদুল্লা কায়সার মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯৪২ সালে। অতঃপর প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এ কলেজ হতে আই.এ. (১৯৪৪) ও অর্থনীতিতে অনার্সসহ দ্বিতীয় বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বি.এ (১৯৪৬) ডিগ্রি লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতিতে এম.এ. ক্লাশে ভর্তি হন। একই সঙ্গে রিপন কলেজে আইন অধ্যয়ন করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪আগস্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম.এ. ক্লাশে ভর্তি হন। রাজনীতিতে অতিমাত্রায় জড়িয়ে পড়ায় কিছুকাল পর বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ ত্যাগ করেন।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী শহীদুল্লা কায়সার মূলত সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চা করতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নকালে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বামপন্থী ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকায় আসার পর কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিতে যোগদান করেন। গণতান্ত্রিক যুবলীগ (সেপ্টেম্বর ১৯৪৭) গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নির্বাচিত হন (১৯৫১)।

"১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে তিনি অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করেন এবং ৩ রা জুন গ্রেফতার হয়ে প্রায় সাড়ে ৩ বছর কারাভোগ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি পুনরায় গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৮-র ১৪ই অক্টোবর সামরিক শাসক কর্তৃক তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন এবং প্রায় ৪ বছর কারাভোগের পর ১৯৬২-র সেপ্টেম্বরে মুক্তি লাভ করেন।"[১৮]শহীদুল্লা কায়সারের সাংবাদিকতা জীবন শুরু হয় ১৯৪৯ সালে ইত্তেফাকে যোগদানের মাধ্যমে। পরবর্তীতে তিনি দৈনিক সংবাদে সহকারী সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। "এতে 'দেশপ্রেমিক' ছদ্মনামে 'রাজনৈতিক পরিক্রমা' ও 'বিশ্বকর্মা' ছদ্মনামে 'বিচিত্র কথা' শীর্ষক উপসম্পাদকীয় রচনা করেন।"[১৯] তাঁর এই লেখাগুলো সেইসময় ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক জনজীবনের আলেখ্য রূপায়ণে দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন। বাঙালি

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংগ্রামী চেতনা তাঁর উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়। সময়. সমাজ ও ইতিহাস প্রবাহের অন্তর্গত ব্যক্তি ও সমষ্টিকে সমগ্র দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ ও রূপায়ণে তাঁর উপন্যাস অনবদ্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হচ্ছে–

উপন্যাস : সারেং বৌ (১৯৬২), সংশপ্তক (১৯৬৫), কৃষ্ণচূড়া মেঘ, তিমির বলয়, দিগন্তে ফুলের আগুন, সমুদ্র ও তৃষ্ণা, চন্দ্রভানের কন্যা, কবে পোহাবে বিভাবরী (অসমাপ্ত) ইত্যাদি।

স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ : রাজবন্দীর রোজনামচা (১৯৬২)

ভ্রমণকাহিনী: পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ (১৯৬৬)।

শহীদুল্লা কায়সারের প্রধান উপন্যাস 'সারেং বৌ' (১৯৬২) এ প্রবাসী সারেং ও তার অসহায় পত্নীর অস্তিত্বের সংগ্রামের কথা বর্ণিত হয়েছে। 'সারেং বৌ' এর কাহিনী অবলম্বনে চলচ্চিত্র এবং 'সংশপ্তক' অবলম্বনে একটি জনপ্রিয় টিভি নাটক নির্মিত হয়। সমকাল সংলগ্ন ও প্রতিরোধ চেতনায় উদ্দীপ্ত তাঁর উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে নতুন মাত্রা দান করেছে। বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি আদমজী সাহিত্য পুরষ্কার (১৯৬২) এবং বাংলা একাডেমী পুরষ্কার (১৯৬২) লাভ করেন।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদের এই বিশিষ্ট তাত্ত্বিক মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র দুই দিন পূর্বে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর এদেশীয় দোসর আলবদর বাহিনী কর্তৃক ঢাকার কায়েতটুলীর নিজ বাসভবন হতে অপহৃত হন। পরবর্তীতে তাঁর আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯)

বাংলা কথাসাহিত্যের একজন সব্যসাচী লেখক ছিলেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। সৃষ্টিশীল সাহিত্যের প্রতিটি পর্বেই তিনি রেখে গেছেন তাঁর মননশীলতার ছায়া। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৬মে (১৩৩৯ সালের ২২ বৈশাখ)-বৃহত্তর ঢাকার, বর্তমান নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার রামনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। 'আলাউদ্দিন আল আজাদ' তাঁর প্রকৃত নাম নয়। 'আল আজাদ' নামটি লেখক পরবর্তীতে তাঁর 'আলাউদ্দিন' মূল নামের সাথে যুক্ত করেন ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের 'মানিক বন্দোপাধ্যায়' হিসেবে খ্যাত এই প্রগতিশীল লেখকের শিক্ষাজীবন কাটে নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭০ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যলয় হতে 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন ও কবিতা' বিষয়ে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর পেশাজীবন শুরু করেন। নারায়ণগঞ্জের তোলারাম কলেজের লেকচারার হিসেবে তাঁর শিক্ষকতা জীবনের সূচনা। এরপর জগন্নাথ কলেজে (বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়), সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, ঢাকা কলেজ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি পেশাগত জীবনে রাশিয়ার মস্কোতে বাংলাদেশ দূতাবাসের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা, শিক্ষা সচিবসহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

কৃষিভিত্তিক পরিবারের সন্তান আলাউদ্দিন আল আজাদের জীবন সংগ্রাম শুরু হয় পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র থাকাবস্থায় বাবা আবদুস সোবহানকে হারানোর পর। এর আগেই মাত্র একবছর বয়সে হারিয়েছিলেন মা মোসাম্মৎ আমেনা খাতুনকে। মা-বাবা হারানো পর তিনি বেড়ে উঠতে থাকেন দাদীর আশ্রয়ে। শেষে দাদীকে হারিয়ে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে যান। তিনি তিন টাকা ধার করে ঢাকায় আসেন এবং আশ্রয় পান পুরান ঢাকার ঘোড়ার গাড়ীওয়ালার আস্তবলের পার্টিশন দেয়া অর্ধেক অংশে।

আজীবন জীবনসংগ্রামী আলাউদ্দিন আল আজাদ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে অংশ নেন। তিনিই প্রথম 'শহীদ মিনার' নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। বামপন্থী আন্দোলন ও প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনেও তিনি সাহসী ভূমিকা পালন করে। বামপন্থী কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি কয়েকবার জেলও খেটেছেন।

নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় ১৯৪৬ সালে কলকাতার "সওগাত" পত্রিকায় আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রথম প্রবন্ধ 'আবেগ' ও ছোটগল্প 'জানোয়ার' প্রকাশিত হয়। ১৯৫০ সালে ঢাকা কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় তার 'গল্প সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়।

কবিতা, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস সহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তিনি স্বাতন্ত্র্যের সাক্ষর রেখেছেন। প্রগতিশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রেম-বিদ্রোহ, সমাজ পরিবর্তন ও মানবমনের অন্তর্লীন রহস্য উন্মোচনে প্রয়াসী ছিলেন। ১৯৬০ তাঁর প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাস 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' প্রকাশিত হয়। যা পরবর্তীকালে ইংরেজি, হিন্দি, রুশ, উর্দু, জার্মান ও বুলগেরিয় ভাষায় অনূদিত হয়। ১৯৭১ সালের মধ্যে রচিত তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য রচনা নিম্নরূপ-

উপন্যাস: তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০), শীতের শেষরাত বসন্তের প্রথম দিন (১৯৬২), কর্ণফুলী (১৯৬২), ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪)।

গল্পগ্রন্থ : জেগে আছি (১৯৫০), ধানকন্যা (১৯৫১), মৃগনাভি (১৯৫৩), অন্ধকার সিড়ি (১৯৫৮), উজান তরঙ্গে (১৯৬২) ।

নাটক : ধন্যবাদ (১৯৫১), মরক্কোর জাদুকর(১৯৫৯), ইহুদীর মেয়ে (১৯৬২), মায়ারী প্রহর (১৯৬৩) ।

বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়, এই মৌলিক প্রতিভাবান শিল্পী তাঁর সাহিত্য জীবনে অনেক পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। এর মধ্যে বাংলা একাডেমী পুরষ্কার (১৯৬৫), ইউনেস্কো পুরষ্কার (১৯৬৫) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যের এই অনন্য শিল্পী ২০০৯ সালের ৩ জুলাই তাঁর উত্তরার নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন।

জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২)

জীবনমুখী সমাজসচেতন কথাসাহিত্যিক জহির রায়হান ছিলেন একাধারে সাহিত্য শিল্পী, সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী ও চলচ্চিত্রকার। সৃষ্টিশীলতায়, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় জহির রায়হানের দীপ্র পদচারনা ছিল সর্বজন প্রশংসিত। জহির রাযহান ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে আগস্ট ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা হাবিবুল্লাহ কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক এবং ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। জহির রায়হানের প্রকৃত নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। কথাসাহিত্যিক শহীদুল্লা কায়সার তাঁর অগ্রজ ছিলেন।

জহির রায়হান কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। দেশবিভাগের পর তিনি পিতৃ পরিবারের সাথে কলকাতা থেকে নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ১৯৫০ সালে আমিরাবাদ উচ্চবিদ্যালয় হতে ম্যাট্রিক পাশ করেন। আই.এস.সি পাশ করার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হন এবং সেখান হতে অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫০ সালে 'যুগের আলো' পত্রিকায় সাংবাদিকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা ঘটে। পরবর্তীতে তিনি 'খাপছাড়া', 'যান্ত্রিক', 'সিনেমা',

Dhaka University Institutional Repository

'প্রবাহ' প্রভৃতি পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। "অল্প বয়সেই জহির রায়হান কমিউনিস্ট রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। তখন কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিলো। তিনি কুরিয়ারের দায়িত্ব পালন করতেন অর্থাৎ একস্থান হতে অন্যস্থানে চিঠি ও সংবাদ পৌছে দিতেন। গোপন পার্টিতে তাঁর নাম রাখা হয় 'রায়হান'। পরবর্তী সময়ে তিনি জহির রায়হান নামে পরিচিত হন।"[২০]

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে জহির রায়হান সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে আমতলার বিখ্যাত সভায় উপস্থিত ছিলেন । ২১শে ফেব্রুয়ারি যে দশজন ১৪৪ ধারা প্রথম ভঙ্গ করেন, জহির রায়হান ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মিছিল থেকে গ্রেফতার হয়ে তিনি কারারুদ্ধ হন। তিনি ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। জহির রায়হানের লেখালেখির সূচনা ছাত্রজীবনে ঘটে। ১৯৫৪ সালে তাঁর প্রথম গল্পসংগ্রহ 'সূর্যগ্রহণ' প্রকাশিত হয়। তিনি মূলত মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। সমাজ জীবনের নানা বৈষম্য অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছিলেন শিল্পীর দায়িত্ববোধ হতে। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হলো-

উপন্যাস : সূর্যগ্রহণ (১৯৫৪), হাজার বছর ধরে (১৯৬৪), শেষ বিকেলের মেয়ে (১৯৬৭), আরেক ফাল্গুন (১৯৬৯), বরফ গলা নদী (১৩৭১), আর কতদিন (১৩৭৭) ইত্যাদি।

গল্পগ্রন্থ : জহির রায়হানের গল্পসংগ্রহ।

সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক পরিচয় ছাপিয়ে তিনি পরবর্তী জীবনে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন চলচ্চিত্রকার হিসেবে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য। উর্দু ছবি 'জাব হুয়া সাবেরা' তে সহকারী পরিচালক হিসেবে তিনি চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু করেন। ১৯৬১ সালে তার প্রথম পরিচালিত ছবি 'কখনো আসেনি' মুক্তি পায়। ১৯৬৪ সালে জহির রায়হানের তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম রঙিন ছবি 'সংগম' (উর্দু ভাষায় নির্মিত) এবং ১৯৬৫ সালে তাঁর প্রথম সিনেমাস্কোপ 'বাহানা' নির্মান করেন।

মুক্তিযুদ্ধ তাঁর জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। "১৯৭১ সালের পর তিনি কলকাতায় যান। সেখান থেকেই পাকিস্তানি সামরিক জান্তার গণহত্যার চিত্র সম্বলিত 'স্টপ জেনোসাইড' নির্মাণ করেন। ছবিটি পৃথিবীজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে।"[২১] 'জীবন থেকে নেয়া' ছবিতে প্রতীকী কাহিনীর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি স্বৈরাচারি শাসনকে চিত্রিত করা হয় এবং জনগণকে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে উদ্বুদ্ধ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

জহির রায়হান ১৯৬১ সালে চলচ্চিত্র অভিনেত্রী সুমিতা দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন এবং ১৯৬৮ সালে অপর চলচ্চিত্র অভিনেত্রী সুচন্দাকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। জহির রায়হান সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বিভিন্ন পদকে ভূষিত হন। সেগুলির মধ্যে 'আদমজী সাহিত্য' পুরস্কার, 'বাংলা একাডেমী' পুরস্কার (১৯৭২) উল্লেখযোগ্য।

"১৯৭১ সালে জহির রায়হানের জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা প্রখ্যাত লেখক শহীদুল্লাহ কায়সারকে অজ্ঞাতনামা দুবৃত্তরা তাঁর বাসভবন থেকে তুলে নিয়ে যায়। ১৯৭২ সালের ৩০শে জানুয়ারী তিনি খবর পান যে, শহীদুল্লা কায়সারকে ঢাকার মিরপুরে রাখা হয়েছে। তিনি তাকে উদ্ধারের জন্য সেখানে যান। কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেননি। ঐ দিনটি জহির রায়হানের অন্তর্ধান দিবস হিসেবে পালন করা হয়।"[২২] আক্ষরিক অর্থে জহির রায়হান ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। আমাদের দেশে ষাটের দশক মূলত শিল্প সাহিত্য চর্চার প্রস্তুতিপর্ব। এই প্রস্তুতিপর্বেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কালজয়ী সব উপন্যাস। ভাষাগত সচেতনতায় এদেশের মানুষের আর্থ সামাজিক সংকটকে তিনি তাঁর উপন্যাসে বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর সীমিত উপন্যাসে হয়তো বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা কম ছিল, কিন্তু গভীরতায় তা ছিল অসাধারণ।

সৈয়দ শামসুল হক (জন্ম ১৯৩৫)

সৈয়দ শামসুল হক আবহমান বাংলা সাহিত্যের এক বহুমাত্রিক লেখক। সাহিত্যের সব শাখাতেই বিচরণ করেছেন কিন্তু তাঁর প্রথম পরিচয় কবি হিসেবে। সব্যসাচী এই সাহিত্যিকের জন্ম ১৯৩৫ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর কুড়িগ্রামে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বাবা সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন ও মা হালিমা খাতুনের আট সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে বড় সৈয়দ শামসুল হক।

সৈয়দ শামসুল হক ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হতে ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিক, ১৯৫২ সালে জগন্নাথ কলেজ হতে আই.এ পাস করেন। তিনি ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হলেও শেষ করেননি। সৈয়দ শামসুল হক পেশাগত জীবনে একজন সাংবাদিক ছিলেন। তিনি লন্ডনে বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রযোজক ছিলেন ১৯৭২-৭৮ সাল পর্যন্ত । পরবর্তীতে তিনি লেখালেখিকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৫ সালে সৈয়দ শামসুল হক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন মনোবিশেষজ্ঞ ও ঔপন্যাসিক আনোয়ারা সৈয়দ হকের সাথে। তাঁদের দুই সন্তান। মেয়ে বিদিতা ও ছেলে দীপ্ত নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম ছোট গল্প প্রকাশিত হয় স্বনামধন্য সাংবাদিক লেখক ও টিভি ব্যক্তিত্ব ফজলে লোহানী কর্তৃক সম্পাদিত 'অজ্ঞাত' ম্যাগাজিনে। মূলত পঞ্চাশের দশকে কবি হিসেবেই আমাদের সাহিত্য ভুবনে তাঁর আবির্ভাব। ছয় দশকের নিরন্তর সাধনায় বাংলা কাব্যধারায় তিনি নিজস্ব এক ভুবন নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন ।

ছোট গল্প ও উপস্যাসের ক্ষেত্রেও সৈয়দ হকের আর্বিভাব পঞ্চাশের দশকেই । তিনি প্রধানত নগরজীবনের গল্পকার। তাঁর ছোটগল্পের প্রেমের পটভূমিতে তিনি নির্মাণ করেছেন আধুনিক নগরজীবনের বহুমুখী যন্ত্রণার কথা, নাগরিক মধ্যবিত্তের হতাশা ব্যর্থতা আর আত্মদহনের মধ্যদিয়ে যা রূপায়িত হয়েছে। শীত বিকেল (১৯৫৯), র ক্তগোলাপ (১৯৬৪), আনন্দের মৃত্যু (১৯৬৭), প্রাচীন বংশের নি:স্ব সন্তান (১৯৮২), তার দৃষ্টান্তমূলক ছোটগল্প । উপন্যাসে তিনি ধারণ করতে চেয়েছেন অবচেতন- আকাঙ্ক্ষাপীড়িত বিকৃত বিপন্ন নাগরিক মধ্যবিত্তের প্রাত্যহিক জীবনে। "মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী কালখণ্ডে প্রকাশিত 'এক মহিলার ছবি' (১৯৫৯), 'দেয়ালের দেশ ' (১৯৫৯), 'অনুপম দিন' (১৯৬২), 'সীমানা ছাড়িয়ে' (১৯৬৪) এসব উপন্যাসে সৈয়দ হকের আত্মমগ্ন ঔপন্যাসিক প্রতিভার প্রতিফলণ ঘটেছে। মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে সৈয়দ হক লিখেছেন 'নিষিদ্ধ লোবান', 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী' (১৯৮৯), বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ (১৯৯০) ইত্যাদি।"[২৩]

যেসব গ্রন্থ মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে রচিত হয়েছে সেসব হলো -

গল্প : তাস (১৯৫৪), শীত বিকেল (১৯৫৯), রক্তগোলাপ (১৯৬৪), আনন্দের মৃত্যু (১৯৬৭) ।

উপন্যাস: এক মহিলার ছবি (১৯৫৯), অনুপম দিন (১৯৬২), সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪) ।

কবিতা : একদা এক রাজ্যে (১৯৬৯), বিরতিহীন উৎসব (১৯৬৯), বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা (১৯৭০) ।

বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি বিভিন্ন পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে তিনি বাংলা একাডেমী পুরষ্কার (১৯৬৬), আদমজী সাহিত্য পুরষ্কার (১৯৬৯) পান। স্বাধীনতা উত্তরকালে স্বাধীনতা পদক (১৯৯০) ও একুশে পদক (১৯৮৫) সহ বহু সংখ্যক পুরষ্কার লাভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. বাংলা পিডিয়া, খণ্ড -১, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ-মার্চ ২০০৩, পৃষ্ঠা ২১৬-২১৭

২. প্রাগুক্ত

৩. বাংলা পিডিয়া , খণ্ড-১০, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪

৪. প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত

৬. মাহমুদুল বাসার, জনতার জাগ্রত হৃদয়ে শত্তকত ওসমান, সাহিত্য পৃষ্ঠা ৮, দৈনিক যায়যায়দিন, ২রা জানুয়ারী, ২০০৯.

৭. বাংলা পিডিয়া, খণ্ড - ৯, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৫- ২৪৬

৮. বাংলাপিডিয়া, খণ্ড -১০, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬৯- ২৭০

৯. প্রাগুক্ত।

১০.প্রাগুক্ত।

১১. রফিকুল্লাহ খান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ: সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকা এক শিল্পী, কালের খেয়া, দৈনিক সমকাল, শুক্রবারের সাময়িকী ঈদসংখ্যা, ৯ই অক্টোবর ২০০৯, ১৯৯ সংখ্যা।

১২. আহমদ কবীর, জীবনী গ্রন্থমালা, সরদার জয়েনউদ্‌দীন, বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী -১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৯-১০

১৩. বাংলাপিডিয়া, খণ্ড –১০, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩

১৪. বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-০৯, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮৯-২৯০

১৫. আবদুল মতিন, শামসুদ্দিন আবুল কালাম ও তার পত্রাবলী, র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশান্স, জানুয়ারী-১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১৬১-১৬৩

১৬. প্রাগুক্ত

১৭. আবু ইসহাক-উপন্যাস সমগ্র, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, লেখক পরিচিতি, ফেব্রুয়ারী -২০০৩

১৮. বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-৯, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৭৫-২৭৬

১৯. বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ৩৬৭

২০. বাংলাপিডিয়া, খণ্ড -৩, প্রাগুক্ত ,পৃষ্ঠা ৪৯৩

২১. প্রাগুক্ত

২২. প্রাগুক্ত

২৩. বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩৩-৪৩৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

উপন্যাসে জনজীবনের স্বরূপ বিশ্লেষণ

গত দুই যুগের (১৯৪৭-১৯৭১) বাংলাদেশের উপন্যাস, বিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিরাট স্থান অধিকার করে রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা এবং দেশবিভাগ জনিত মানবিক বিপর্যয় লেখকদের শিল্পমানসকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। "উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উন্মূলিত-অস্তিত্ব গ্রামীণ জনস্রোতের নগরমুখিতা, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি এই ভূখণ্ডের জীবন বিন্যাসকে করে জটিল ও দ্বন্দ্বময়। ... প্রচলিত মূল্যবোধ, সামন্ত ধ্যান-ধারণা, মানুষের অস্তিত্ব বিষয়ক উদ্বেগ ও জিজ্ঞাসা অনিবার্য সংঘাত ও পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়।"[১] এ পর্যায়ে দেশভাগের পটভূমিতে রচিত উপন্যাসের সংখ্যাই বেশি।

পূর্ববাংলার সমাজজীবনের বৃহৎ অংশই ছিল গ্রামের সাধারণ মানুষ। সাতচল্লিশ পরবর্তী ঔপন্যাসিকগণ জীবিকা সূত্রে সবাই প্রায় শহরবাসী ছিলেন । এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হিসেবে ঢাকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলেও বাংলাদেশের সাহিত্যচর্চায় ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস ভাবনার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে মূলত গ্রামীণ উপন্যাসেই। পূর্ববাংলার কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, অশিক্ষিত-অনগ্রসর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাবনাবলয় স্থান পেয়েছে সমাজ সচেতন সৃষ্টিশীল লেখকের অভিজ্ঞতা ও মমত্ববোধে। গ্রামীণ জীবনের খুটিনাটি এবং বৈচিত্র্যের ভিন্নতাই গ্রামীণ উপন্যাসকে এনে দিয়েছে অনন্যতা। গ্রামজীবনের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসে উঠে এসেছে নগরজীবনের মানুষের কথাও । এই ভাবে তৎকালীন লেখকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা আমাদের সাহিত্যের একটি মূল্যবান ভিত রচনা করে দিয়েছিল। ঔপন্যাসিকদের গভীর দৃষ্টিভঙ্গির সাহচার্যে নির্মিত হয়েছিল বাংলাদেশের উপন্যাসের বহুমাত্রিক পদচারণা।

প্রত্যেকটি উপন্যাসেই জীবনের সত্যিকারের সামাজিক প্রতিচ্ছবি রয়েছে। জনজীবনের স্বপ্ন-কল্পনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংস্কার, মূল্যবোধ ও জীবনাচরণের সচিত্র সচল উপস্থাপনার দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছিলেন সেই সব ঔপন্যাসিকের প্রধান প্রধান উপন্যাস বর্তমান গবেষণার আলোচ্য বিষয়। প্রকৃতপক্ষে আজকের বাংলাদেশের যে উপন্যাস সাহিত্য, তার যাত্রা শুরু হয়েছিল চল্লিশের দশকেই এবং পূর্ণতা পেয়েছে ষাটের দশকে। এই সব ঔপন্যাসিকই বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে পালন করেছেন পথিকৃতের ভূমিকা এবং

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যকে উন্নীত করেছেন মননশীল সাহিত্যের ধারায়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে শিল্পগুণ সমৃদ্ধ যেসব জীবন ঘনিষ্ঠ রচনা আমাদের অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়কে ভাবিয়ে তোলে সেই সব উপন্যাসকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হবে। যেমন:

১. গ্রামীণ জীবন ভিত্তিক উপন্যাস

২. নগর কাহিনী-প্রধান উপন্যাস

৩. গ্রাম-নগর মিশ্রজীবন ভিত্তিক উপন্যাস এবং

৪. ঐতিহাসিক, রূপকাশ্রয়ী ও অন্যান্য বিষয়ক উপন্যাস।

গ্রামীণ জীবন ভিত্তিক উপন্যাস

লালসালু (১৯৪৮)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ গ্রামবাংলার পটভূমিতে রচনা করেছেন তাঁর নান্দনিক উপন্যাস *লালসালু* । এটি বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে আধুনিকতার এক ধ্রুপদী দৃষ্টান্ত। দেশ বিভাগ (১৯৪৭) পরবর্তী সময়ের এই উপন্যাসে, বিশেষ করে মানুষের সেই সব প্রবণতাকে রূপায়িত করা হয়েছে যা মানুষের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কখনো সংগ্রামমুখর কখনো বা কৌশলপরায়ণ। একদিকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার ও মৌলবাদী চর্চা, অন্যদিকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা গ্রামীণ সমাজ বিন্যাসে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রগতিশীল লেখক হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্কে দারুণভাবে মর্মাহত করেছিল রাজনৈতিক উপাদানে মিশ্রিত এই সব কুসংস্কার। সেই বিচারে *লালসালু* তাঁর নিজস্বতার এক শিল্পীত নিদর্শন যাকে সামাজিক নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাস বললে ভুল হবে না। এই উপন্যাসে ধর্মের নামে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভোগবাদী এক চরিত্র মজিদকে অসম্ভব দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

লালসালু উপন্যাসে দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে অস্তিত্ব সন্ধান প্রয়াসী মজিদ জীবিকার অন্বেষণে মহব্বত-নগরে আগমন করে। জঙ্গলের মধ্যে জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বহু পুরাতন একটি কবরকে মোদাচ্ছের পীরের মাজার অভিহিত করে, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে কিভাবে ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ী হয়ে ওঠে সেই কাহিনীই

Dhaka University Institutional Repository

লালসালু র উপজীব্য বিষয়। গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে পুঁজি করে তাদের ভেতর সংস্কার লালিত ধর্মভয়, ধর্মীয় গোড়ামি, কুসংস্কার ইত্যাদি জাগিয়ে তুলে সে লাভবান হতে থাকে। মজিদ এমনই এক গ্রামের মানুষ *"যেখানে শষ্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি ।"*[২] গ্রামের অধিকাংশ মানুষই ক্ষুধা-দারিদ্র্যের শিকার। মজিদ ধুরন্ধর, নিজের অস্তিত্ব বিনাশ করতে চায় না। মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে ঘিরে তার যত ভণ্ডামী।

> "-আপনারা জাহেল, বেএলেম, আনপাড়হ্। মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন ? ... উনি একদিন স্বপ্নে ডাকি বললেন ... ।"[৩]

এভাবে সে মিথ্যা কৌশল কাজে লাগায়। মজিদের মত আধ্যাত্মজ্ঞানসম্পন্ন একজন নতুন মানুষের কথায় গ্রামবাসীরা চমকিত হয়। নিজেদের নিবুর্দ্ধিতায় তারা অনুশোচনায় ভোগে। তাদের যেন মোহভঙ্গ ঘটে। আস্তে আস্তে তারা মজিদকে ভয় পেতে শুরু করে। এই ভাবে মহব্বতনগরে যখন মজিদ খেয়ে পরে বেঁচে থাকার সংগ্রামে সফল হয় তখন সে নিজের অস্তিত্বকে আরো সুদৃঢ় করতে চায়। জীবনকে উপভোগ করতে চায় অন্যভাবে–

> "একদিন মজিদ বিয়েও করে। অনেকদিন থেকে আলি-ঝালি একটি চওড়া বেওয়া মেয়েকে দেখেছিল। দেহে যৌবন যেন ব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে, বিশাল তার রূপ। দূর থেকে আবছা আবছা তার প্রশস্ত দেহ দেখে শীর্ণ মজিদ জ্বলে উঠেছিল।
>
> শেষে সেই প্রশস্ত ব্যাপ্ত-যৌবনা মেয়েলোকটিই বিবি হয়ে তার ঘরে এলো। নাম তার রহীমা।"[৪]

রহীমাকে বিয়ে করেও শেষ পর্যন্ত মজিদ সুখী হতে পারেনি। কারণ রহীমার আচরণে সব সময়ে ফুটে উঠত মজিদের প্রতি ভয়-ভক্তি, শ্রদ্ধা মিশ্রিত এক অনুভূতি। একদিন যখন হঠাৎ মাজারের কাপড় উল্টিয়ে মাজার কিছুটা নগ্ন হয়ে পড়ে, তখন যেন মজিদ বিস্ময়কর ভাবে নিজেকে একা মনে করে। কারণ যে কবর নিয়ে তার ব্যবসা সেই কবরের মানুষটি প্রকৃত পক্ষে তার কাছে অপরিচিত। নিঃসঙ্গতা ও ভয় কাটাতে মজিদ উত্তরাধিকারের ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে। ঘরে সুস্থ সবল স্ত্রী থাকতে উত্তরাধিকারের দোহাই দিয়ে কিশোরী জমিলাকে সে বিয়ে করে। যা মজিদের নারীলোলুপতার আর এক দৃষ্টান্ত। সত্যিকার অর্থে জমিলাকে বিয়ের সিদ্ধান্ত ছিল মজিদের জীবনের এক চরম ভুল। জমিলা মজিদকে কখনো ভালবাসেনি। সামাজিকতা এবং ধর্মের ভয়ে প্রতিবাদ না করলেও বিভিন্নভাবে তাচ্ছিল্যভরা আচরণের মাধ্যমে সে মজিদকে বুঝিয়েছে ধর্মীয় অনুশাসনের দোহাই দিয়ে গ্রামের মানুষকে বোকা বানালেও মানুষের মনকে জয়

Dhaka University Institutional Repository

করা সত্যিকার অর্থে কঠিন। পর্দাহীনভাবে জমিলার ঘোরাফেরা, নামায পড়তে ভুল হওয়া, সেজদায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া এমন কি উত্তেজিত হলে মজিদের মুখে থুথু ছিটেয়ে দেয়া প্রভৃতি আচরণের জন্য ক্রোধান্বিত মজিদ জমিলাকে একটা চরম শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এক ঝড়ের রাতে জমিলাকে মোদাচ্ছের পীরের মাজারে কোরবানির পশুর মত খুটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে–

"কাইল তুমি দেখবা দিলে তোমার খোদার ভয় আইছে, স্বামীর প্রতি ভক্তি আইছে, মনে আর শয়তানি নাই"[৫]

এত কিছু করেও মজিদ ব্যর্থ হয়েছে। সে ছিল প্রকৃত অর্থে কামনা-বাসনায় পরিপূর্ণ একজন লম্পট যে নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রেখে তার পরিধি বিস্তারে কূটকৌশলী। তবুও সে জমিলাকে নিজের মত করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। পক্ষান্তরে জমিলা সর্বপ্রকার ধর্মীয় অনুশাসনকে প্রত্যাখান করে মজিদের মধ্যে একপ্রকার ভীতি সঞ্চারে সমর্থ হয়েছে। মোদাচ্ছের পীরের মাজারে জমিলার মেহেদীরাঙ্গা পদাঘাত যেন তাই সাধারণ মানুষকে শোষণ করার শাস্তি স্বরূপ সমাজকে সচেতন করার ইঙ্গিত বহন করে।

..."মেহেদি দেয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে। পায়ের দুঃসাহস দেখে মজিদ মোটেই ক্রুদ্ধ হয় না, ... মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী যেন একটা ওলট-পালট হয়ে যাবার উপক্রম করে, একটা বিচিত্র জীবন আদিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে ক্ষীণকালের জন্য প্রকাশ পায় তার চোখের সামনে, আর একটা সত্যের সীমানায় পৌছে জন্মবেদনার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করে মনে মনে।"[৬]

এভাবেই মজিদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম এবং জমিলার জীবন চৈতন্যের প্রাগ্রসরতার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। "ধর্মশক্তি ও আর্থ-সামাজিক শক্তির সমন্বয়ে সৃষ্ট শোষণের রূপ এভাবেই উন্মোচিত হয়েছে উপন্যাসে। দুই শক্তির সম্মিলনে শোষণের যে প্রকৃতি-প্রক্রিয়া *লালসালু* উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে, তা মহব্বতনগরের প্রতীকে সমগ্র বাংলাদেশেরই প্রতিরূপ।"[৭]

আমাদের সমাজব্যবস্থায় মজিদের মত মানুষের মূল প্রোথিত রয়েছে শোষণমূলক ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থার গভীরে। এই উপন্যাসের কাহিনী আমাদের সমাজের বস্তুগত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। *লালসালু* উপন্যাসে চরিত্র-চিত্রণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নির্মোহ ছিলেন। সমাজ সচেতন শিল্পীর দৃষ্টিতে সমাজের প্রতিটি তুচ্ছ অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তাহের-কাদেরের বাপের কথা উল্লেখ করা যায়। সে মহব্বত নগরের একজন নিম্নবিত্ত কৃষক। মজিদের প্রতি অবিশ্বাসের কারণে এক ঝড় জলের রাতে মজিদের চক্রান্তে তাকে চিরদিনের জন্য গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়। মজিদ নিজের প্রভাব বিস্তার করতে তাহের-কাদেরের বাপের মত সাধারণ মানুষকেও পুঁজি করতে ছাড়ে নি। তাই সে এই নির্বিবাদ মানুষটিকে ক্ষমার পরিবর্তে এভাবে শাস্তি প্রদান করেছে। যে খালেক ব্যাপারী ছাড়া মজিদের কোন বিচার-শালিশের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় না মজিদ সেই খালেক ব্যাপারীর মত গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তির স্ত্রী আমেনাকে পর্যন্ত ধর্মীয় ফতোয়া দিয়ে তালাক দিতে বাধ্য করে। কারণ "মজিদের পীরত্বে অবিশ্বাস করেই স্বামীর প্রতি দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের মতো বিশ্বস্ত থেকেও অবিশ্বস্ততার অনপনেয় কলঙ্ক মাথায় নিয়ে আমেনাকে 'চিরদিনের জন্য' বাপের বাড়ি যাত্রা করতে হয়েছে।"[৮] স্ত্রীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস থাকতেও মজিদ খালেক ব্যাপারীর মধ্যে খোদার ভয় জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছে।

> "পানি পড়াডা খাইয়া তানি যখন সাত পাক দিবার পারলেন না, মূর্ছা গেলেন, তখন তাতে সন্দেহের আর কোন কথা নাই। খোদার কালামের সাহায্যে যে কথা জানা যায় তা সূর্যের রোশনাইর মত সাফ। আর বেশি আমি কিছু কমুনা। তানারে তালাক দেন।"[৯]

খালেক ব্যাপারীর মত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির সন্তান কামনাকে কেন্দ্র করে এত সব ঘটনা ঘটে। স্ত্রী আমেনার কথা মত শ্যালক ধলা মিয়া আওয়ালপুরের পীরের পানি পড়া নিয়ে আসে। এই কথা গোপন থাকে না মজিদের কাছে। তাকে রেখে আওয়ালপুরের পীরের কাছে গোপনে পানি পড়া আনতে যাওয়াতে সে অপমানিত বোধ করে, যার ফলশ্রুতিতে খালেক ব্যাপারী তার প্রতিহিংসার স্বীকার হয়। আমেনার সাথে খালেক ব্যাপারীকেও যেন স্পর্শ করেছে এই অমানবিক শাস্তি। খালেক ব্যাপারী তালাকের সিদ্ধান্তে মন স্থির করতে পারছিল না। তার জিভ যেন অসাড় হয়ে আসছিল 'একটি মাত্র শব্দের তিনবার উচ্চারণে'। শেষ পর্যন্ত খোদার ভয়ে ভীত হয়ে মজিদের কথা মত সে তার দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটায়।

হাসুনির মায়ের চরিত্র, তার কার্যকলাপের মাধ্যমে উপন্যাসে বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছে। গ্রামের শিক্ষিত যুবক আক্কাস স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে মজিদ তাকেও কৌশলে পরাভূত করে। স্কুল প্রতিষ্ঠাকে অর্বাচীন বালকের ক্রিয়াকর্ম বলে প্রমাণ করেছে। দুদু মিঞার ক্ষেত্রেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। দুদু মিঞা অপ্রতিবাদী, গ্রামীণ প্রকৃতির মতোই শান্তশিষ্ট মানুষ। মধ্যবয়সে তার খাতনা হওয়ার ঘটনা নির্মম ও অমানবিক। মজিদের ভীত নড়িয়ে দিয়েছে মূলত আওয়ালপুরের পীর। গ্রামের মানুষ যখন আওয়ালপুর অভিমুখী হয়েছে তখন মজিদ নিজের অস্তিত্বকে সসম্মানে টিকিয়ে রাখতে অতিসচেতনভাবে অগ্রসর হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

এই সমস্যা সমাধানে। আওয়ালপুরে গিয়ে 'ক্ষ্যাপা কুকুর'এর মতো নামাযরত মুসল্লিদের উদ্দেশ্য করে বলেছে-

> "যতসব শয়তানি, বে'দাতি কাজকারবার। খোদার সঙ্গে মস্করা! নামায ভেঙ্গে কেই কথা কইতে পারে না। তাই তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাই নীরবে মজিদের অশ্রব্য গালাগালি শুনলে। ...
> এ কেমন বেশরিয়তি কারবার, আছরের সময় জোহরের নামায পড়া?"[১০]

নতুন পীরের বিরুদ্ধে এই ভাবে সে কৌশলে সাধারণ মানুষকে দাঁড় করিয়ে দেয়। মানুষের মধ্যে খোদার ভয় জাগ্রত করে পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসে। অর্থাৎ যখনই মজিদ নিজের অস্তিত্বকে বিপন্ন মনে করেছে তখনই সে যেকোন প্রকারেই হোক না কেন অস্তিত্ববাদী হয়ে উঠতে কূট-কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে।

লালসালু র জনজীবনের বাস্তবতা, আজও যেন সাম্প্রতিক বলে মনে হয়। মজিদের মত ধর্ম ব্যবসায়ীরা আজ আরো বেশি সংগঠিত ও সুদৃঢ় অবস্থানে রয়েছে। "বস্তুত, *লালসালু* -তে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ঘটনা প্রবাহ ও চরিত্রের কেবলই নিস্প্রাণ বর্ণনা দেননি, নির্ধারিত চরিত্রের জন্য তিনি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতও সৃষ্টি করেছেন। এবং সেই বিশেষ পারিপার্শ্বিকতায় চরিত্রগুলিকে বাস্তব ও জীবন্ত করে তুলেছেন।"[১১] বাস্তবজীবনের কাহিনীকে উপন্যাসের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চিরকালীন সাহিত্যই সৃষ্টি করেছেন নতুন আঙ্গিকে।

সূর্য-দীঘল বাড়ি (১৯৫৫)

আবু ইসহাক *সূর্য-দীঘল বাড়ি* উপন্যাসে গ্রামবাংলার মানুষের ক্ষয়িষ্ণু জীবনের যে ছবি এঁকেছেন তা এক কথায় অসাধারণ, অনবদ্য। গ্রামের মেহনতি মানুষের দারিদ্র্যকে অবলম্বন করে পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেশবিভাগ পরবর্তী স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র তাঁর উপন্যাসে কালজয়ী কাহিনীর সম্মানে প্রশংসিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববাংলার একটি গ্রাম্য-ভূমিহীন নিম্নবর্গ পরিবারের সংগ্রামী নারী চরিত্র জয়গুনের জীবনান্বেষার স্বরূপ উন্মোচনই এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের মূল লক্ষ্য। গ্রামের আবহমানকাল ধরে গড়ে ওঠা সংস্কার, বৈষম্য, শোষণের বাস্তবতাকে উপন্যাসের মূল উপাদান এবং জয়গুনের মাধ্যমে সমাজ চিত্রণে সেগুলির ব্যবহার উপন্যাসটিকে নিপুণ শিল্প উৎপ্রেক্ষায় উন্নীত করেছে । লেখক কাহিনীতে দেখাতে চেয়েছেন ধর্ম নয়, বেঁচে থাকার সংগ্রামই অস্তিত্ব রক্ষায় মানুষের জন্মগত অধিকার। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের বিপর্যয়ের বাস্তব চিত্র রূপায়িত হয়েছে এভাবে-

"আবার তারা গ্রামে ফিরে আসে । ... ভাতের লড়াইয়ে তারা হেরে গেল।

অনেক আশা, ভরসা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে তারা শহরের বুকে পা বাড়িয়েছিল। সেখানে মজুমদারের গুদামে চালের প্রাচুর্য, হোটেলে খাবারের সমারোহ দেখে তাদের জিভ শুকিয়ে যায়। ... রাস্তায় কুকুরের সাথে খাবার কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ক্ষত বিক্ষত হয়। ...

যারা ফিরে আসে তারা বুকভরা আশা নিয়ে আসে বাঁচবার। ...

কিন্তু মানুষের চেহারা নিয়ে নয়। তাদের শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে। পেট গিয়ে মিশেছে পিঠের সাথে। ধনুকের মত বাঁকা দেহ-শুষ্কও বিবর্ণ। তবুও ভাঙ্গা মেরুদণ্ড দিয়ে সমাজ ও সভ্যতার মেরুদণ্ড সোজা করে ধরবার চেষ্টা করে। ... পঞ্চাশের মন্বন্তরে হুঁচোট খাওয়া দেশ আবার টলতে টলতে দাঁড়ায় লাঠি ভর দিয়ে।

দুটি ছেলেমেয়ের হাত ধরে জয়গুনও গ্রামে ফিরে আসে"[১২]

দুর্ভিক্ষের ভয়াল ছোবল থেকে পরিত্রাণের আশায় জয়গুনের দুই সন্তান নিয়ে শহরে গিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি । হতাশাগ্রস্থ হয়ে গ্রামে ফিরে এসে জঙ্গলাকীর্ণ ভিটে পরিষ্কার করে নতুন করে বাঁচার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। মধ্যযুগীয় গ্রামীণ সমাজের কুসংস্কারের কারণে তার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। গ্রাম্য চক্রান্তের স্বীকার হয় সে। অমঙ্গলের আশা করে পূর্বসংস্কারবশত সূর্য দীঘল বাড়ীতে মানুষের বসবাস নিষিদ্ধ । নিরুপায় হয়ে অন্যান্য বাড়ী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জয়গুন যখন ভৌতিক পরিবেশে বাস করা শুরু করে তখন গ্রাম্য লৌকিক বিশ্বাসের ভিত্তিহীনতায় এক অন্যতর পরিস্থিতির স্বীকার হয় সে। বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা জয়গুন পুত্র হাসুকে নিয়ে ট্রেনে চাল এনে ষ্টেশনে বিক্রি করে। হাসু কুলির কাজ করে কোনমতে জীবন নির্বাহে উদ্যোগী হয়। "ধর্ম শাসিত সমাজে মেয়ে মানুষের পক্ষে কাজ করে অর্থ আয় করা অপরাধ । কিন্তু ছেলে-মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ধর্মের অনুশাসন সে ভুলে যায় এক মুহূর্তে । জীবনধারনের কাছে ধর্মের

Dhaka University Institutional Repository

বারণ তুচ্ছ হয়ে যায়, মিথ্যে হয়ে যায় তার কাছে। ... স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ মানুষের মধ্যে প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দের ভবিষ্যৎ কল্পনা জাগ্রত করে । জয়গুন ও আন্দোলিত হয় সাময়িক স্বপ্ন বিলাসে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন জনজীবনে কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। ... জয়গুনদের জীবন অস্তিত্ব মুক্ত আলোর পরিবর্তে ক্রমশ অন্ধকারের দিকে ধাবিত হতে থাকে।"[১৩] করিম বক্শ তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী জয়গুনকে পুনরায় ঘরে তুলতে চেয়ে স্মরণাপন্ন হয় জোবেদ আলী ফকিরের। অর্থলোলুপ জোবেদ আলী জয়গুনের প্রতি কামলোলুপতার প্রকাশ ঘটালে জয়গুনের হাতে অপমানিত হয়। 'সূর্য-দীঘল বাড়ীর' দিকে তার আর মুখ দেখানোর উপায় থাকে না। জয়গুনের দুই সন্তান মায়মুন ও হাসু মায়ের আদর্শেই অল্প জিনিসকে খুশি মনে গ্রহণ করতে শিখেছে । কাসু তাদের নিজের ভাই না হলেও কাসুর সাথে তাদের স্নেহের সম্পর্ক বিদ্যমান। জীবন তার স্বাভাবিক নিয়মে চলে। এর মাঝেও জয়গুন মায়মুনকে বিয়ে দেয়। কাসুর অসুস্থতায় জয়গুন করিম বক্সের বাড়ি গিয়ে কাসুকে মাতৃস্নেহে সুস্থ করে তোলে, করিম বক্শ বাধ্য হয় কাসুকে 'সূর্য দীঘল বাড়ী'তে মায়ের কাছে রাখতে । এরই মাঝে মায়মুনকে শ্বশুরবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। জয়গুন ভেবে পায় না চারটি প্রাণ কি ভাবে বাঁচবে ? করিম বক্শ নতুন করে জয়গুনকে একসাথে থাকার প্রস্তাব দিলে জয়গুন প্রত্যাখ্যান করে। সূর্য-দীঘল বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব বেড়েই চলে।এক অমাবস্যার রাতে করিম বক্শ সেই বাড়ীতে গদু প্রধানকে দেখে ফেলে এবং তাদের হাতে প্রাণ দেয়। শফীর মা সবাইকে নিয়ে 'সূর্য দীঘল বাড়ী' ত্যাগ করতে বলে। সন্তানদের নিয়ে পুনরায় পথে নামে জয়গুন ও শফীর মা। এক অনিশ্চিত গন্তব্যে যাত্রা করে তারা-

> "চল্তে চল্তে আবার জয়গুন পিছন ফিরে তাকায়। সূর্য-দীঘল বাড়ী। মানুষ বসবাস করতে পারে না এ বাড়ীতে । দু'খানা ঝুপড়ি। রোদ বৃষ্টি ও অন্ধকারে মাথা গুঁজবার নীড়। দিনের শেষে, কাজের শেষে মানুষ, পশুপক্ষী এই নীড়ে ফিরবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ... তারা এগিয়ে চলে। বহুদূর হেঁটে শ্রান্ত পাগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য তারা গাছ তলায় বসে। উঁচু তাল-গাছটা এতদূর থেকেও যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আবার তারা এগিয়ে চলে।"[১৪]

এই উপন্যাসে ক্ষুধার বাস্তবতা স্বামী পরিত্যক্তা জয়গুনের জীবনে সবচেয়ে বড় সত্য। এই সত্যই উপন্যাসে মানবতার সংকটের কাহিনী হয়ে উঠেছে। জয়গুন যেন বাংলাদেশের গ্রামীণ নারী সমাজের চিরকালের এক প্রতিনিধি। জয়গুন পর্দা রক্ষা করে চলে না বলে গ্রামের মানুষ তাকে অভিযুক্ত করে। এতে করে জয়গুনের জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থায় জয়গুন বুঝতে পেরেছে সমাজের প্রচলিত প্রথা নারীকে পর্দা রাখতে বাধ্য করলেও তাকে আত্মমর্যাদায় বাঁচতে শেখায় না।

Dhaka University Institutional Repository

"ক্ষুধার অন্ন যার নেই, তার আবার কিসের পর্দা, কিসের কি ? সে বুঝেছে, জীবন রক্ষা করাই ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্র। জীবন রক্ষা করতে ধর্মের যেকোন অপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সে প্রস্তুত । উদরের আগুন নিবাতে দোজখের আগুনে ঝাঁপ দিতেও তার ভয় নেই।"[১৫]

তাই শেষ পর্যন্ত ধর্মের শৃঙ্খল ভেঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ে জীবিকান্বেষণে। গন্তব্য একটাই বেঁচে থাকা, সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখা। তাই বেঁচে থাকার নির্মমতার মধ্যেও সন্তান স্নেহে তার মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হয়ে পড়ে। কাসুকে ডাক্তার দেখানোর জন্য নিজের প্রিয় হাঁস জোড়া পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়।

পূর্ব-বাংলার গ্রামীণ জীবনে মানুষের কুসংস্কার, ঝাড়-ফুঁক, আদিমতা কাহিনীর প্রয়োজনেই বাস্তব-ভাবে উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছে। কন্যা সন্তানের প্রতি অবহেলার বিষয়টিও জয়গুনের মধ্য দিয়ে চিত্রিত হয়েছে । কারণ জয়গুন মায়মুনের চেয়ে ছেলে হাসুকে বেশি করে খেতে দিত। অভাবের যন্ত্রণায় জয়গুনের ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের গভীরে স্বামীর মৃত্যুতে তার প্রতি গভীর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে।

"আহা বেচারা, জীবনে কাউকে ভালবাসে নি, কারো ভালোবাসা পায়নি।"[১৬]

মৃত স্বামীর কথাও সে স্মৃতি থেকে স্মরণ করতো মাঝে মাঝে । বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, তালাক, অভাব প্রভৃতি বিষয়ের বিভৎস রূপের মধ্যেও আমরা দেখি অভাবগ্রস্থতার মধ্যেও মায়ের প্রতি সন্তানের গভীর ভালবাসা। হাসু মাত্র তের বছর বয়স থেকেই জীবন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তবুও মায়মুন ও সৎভাই কাসুর প্রতি ভালবাসা, নিজের পাতের ভাত মায়ের জন্য তুলে রাখা সে শিখেছে মানবিক অনুভূতির নিবিড় অনুভব থেকেই। 'দ্যাশ স্বাদীন'– হওয়ার কথা শুনে তারা স্বপ্ন দেখে পেট ভরে খেয়ে বেঁচে থাকার। তাই দুমুঠো অন্ন-সংস্থানের ন্যূনতম স্বচ্ছলতার আশায় জয়গুন ফিরে এসেছিল আপন ভিটায়। কারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছে দেশ স্বাধীনের তাৎপর্য খুব গভীর। দেশ স্বাধীনের আনন্দে জয়গুনের একমাত্র সবুজ বোম্বাই শাড়িতে স্বাধীন দেশের পতাকা ওড়ে হাসুদের স্থবির গ্রামে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সব স্বপ্ন মিথ্যা হয়ে যায় কঠিন জীবন সত্যের কাছে। জয়গুন অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে-দাঁড়ানো কঠোর সংগ্রামী নারী, জীবন-যুদ্ধের এক অক্লান্ত সৈনিক। সবকিছুর সমন্বয়ে *সূর্য-দীঘল বাড়ী* যেন সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার দলিল। উপন্যাসে কাহিনীর অন্তরালে মানুষের ব্যক্তিক অনুভবকে কথাশিল্পী সামষ্টিক উপলব্ধিতে উন্নীত করতে চেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

জননী (১৯৬১)

জননী উপন্যাসের বিষয় ভাবনাই শওকত ওসমানকে স্বতন্ত্র করেছে অন্যান্য রচনা থেকে। বিভাগোত্তর কালের কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী মহেশডাঙ্গা গ্রামের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসটিতে তৎকালীন মুসলিম সমাজব্যবস্থার এক অমূল্য দলিলও বলা যায়। নিম্নবিত্ত মানুষের চিরকালীন টানাপোড়েনের চিত্র পাওয়া যায় এখানে। প্রসঙ্গক্রমে এ বিষয়ে লেখকের নিজস্ব বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। "কাহিনীর পটভূমি চল্লিশ বছর আগেকার। নতুন পরিবেশে খসড়া উপন্যাসের কিছু অদল-বদল করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এক যুগের দলিল হিসাবে যথাযথ রাখাই যুক্তিসংগত মনে করি।"[১৭]

আজও গ্রাম বাংলার সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত মূল্যবোধ অনেকাংশেই অপরিবর্তিত রয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশে একজন নারীর জীবন সংগ্রামকে এক বিশাল ক্যানভাসে শওকত ওসমান ফুটিয়ে তুলেছেন জীবনাভিজ্ঞতার পরিপূর্ণতায়। *জননী* উপন্যাসের মূল চরিত্র দরিয়া বিবিই সেই নারী যে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য নানামুখী বিরূপ বাস্তবতার ভেতর সংগ্রাম করেও মাতৃত্ব অনুভূতির চরম মূল্য দিতে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। দরিয়া-বিবির পারিপার্শ্বিকতা ও সমাজব্যবস্থাকে তুলে ধরতে গিয়ে লেখক প্রথমেই তৎকালীন গ্রামীণ সমাজ বাস্তবতা ও জীবন বোধের আলোকে সামান্য চাষী আজহার খাঁর চরিত্রের বিন্যাস করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই এর আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে ইংরেজ কূটকৌশল সমন্বিত শাসন ব্যবস্থায়। *জননী* এক সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র চাষী পরিবারের সার্থক গল্প। যা মহেশডাঙ্গা গ্রামের কৃষিভিত্তিক জীবনাচরণের এক জীবন্ত ছবির মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে ।

সামান্য চাষীবধূ দরিয়া-বিবি এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। উপন্যাসটিতে উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমান সমাজের প্রকৃত ছবিটি পাওয়া যায়। সংসারে হরেক কাজের ফাঁকে দরিয়া বিবির অতীতের কথা মনে পড়ে। স্বচ্ছল পরিবারের ঘরের বৌ ছিল, সাপের কামড়ে স্বামীর মৃত্যুর পর অন্যান্য ভাইয়েরা মিলে সম্পত্তি ভাগ করে নেয়। দরিয়ার একমাত্র সন্তান মোনাদিরকে তারা নিজেদের কাজে রেখে দরিয়াকে সংসার থেকে বিতাড়িত করে। বেঁচে থাকার অনিবার্য প্রয়োজনে দরিয়ার বিয়ে হয় অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল পরিবারে। এই সংসারে সে দুই সন্তানের জননী। স্বামী প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। দরিয়া বিবির প্রাণটা কাঁদে আগের পক্ষের সন্তানের জন্য। ঘটনাক্রমে একদিন নিজের প্রথম সন্তানের সাথে তার দেখা হয়। সে চিনতে পারে মোনাদিরকে। মোনাদিরের সাথে অল্পদিনেই তার একটা মমতাময় সম্পর্ক

Dhaka University Institutional Repository

গড়ে ওঠে। অন্যদিকে দেখা যায় আজহার জীবিকার প্রয়োজনে হঠাৎ একদিন অন্যত্র চলে যায়। তখন আজহারের দারিদ্র্যের সুযোগে তার দূরসম্পর্কের ভাই ইয়াকুব আসে দুরভিসন্ধি নিয়ে দরিয়া বিবিকে সাহায্য করতে। দারিদ্র্য ও শোষণ নির্ভর বাংলাদেশে পল্লী সমাজের ব্যবসায়িক মধ্যবিত্তের কামলিপ্সার মর্মন্তুদ কাহিনী ইয়াকুবের মধ্যদিয়ে বিস্তার লাভ করেছে। ইয়াকুব স্বচ্ছল চাষী। ঘরে দু'স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা রয়েছে। ইয়াকুবের সাহায্য নিতে অভাবের সংসারে দরিয়ার আপত্তি বেশিদিন স্থায়ী হয়না। ম্যালেরিয়ায় আজহারের মৃত্যুর পর দরিয়া অভাবের তাড়নায় ইয়াকুবের অসৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেও বাধ্য হয় সাহায্য নিতে।

> "দরিয়া-বিবি আজকাল ইয়াকুবের চাল-চলন সহজে গ্রহণ করে। তার আত্মসম্মান সহজে তীক্ষ্ণ হইয়া ওঠে না। আপন-জন আত্মীয় সে কিছু সঙ্গে আনিলে, অত সংবেদনশীল হইলে চলিবে কেন? ... অবসর সময়ে তার মনে আন্দোলন জাগে। আসলে লোকটা খারাপ নয়। তবে অমার্জিত রুচি। এই জাতীয় দ্বন্দ্বে ভেতর দরিয়া-বিবি সমস্যার সমাধান খোঁজে।"[১৮]

সময়ের প্রয়োজনে গরিব গৃহবধূ বেঁচে থাকার জন্য কিভাবে নানাবিধ সামাজিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে সেই কাহিনী যেন আজও কোনোনা কোনভাবে আমাদের সামজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ তার অভাবের সংসারে ইয়াকুব সন্তানদের ভাল খাওয়া, শিক্ষা ও অন্যান্য আর্থিক সাহায্য অব্যাহত রাখে এবং ধীরে ধীরে লাম্পট্যের জাল বিস্তার করে। একদিন ইয়াকুবের লাম্পট্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হয় তাকে। ইয়াকুবের সাথে অবৈধ সম্পর্কের সূত্র ধরে মাতৃত্বের অনিবার্য কারণে পেটে অবৈধ সন্তান ধারণ করে। দরিয়া-বিবির মানসিক শান্তি নষ্ট হয়েছে অনেক আগেই। যেটুকু স্বস্তি ছিল তাও বিসর্জন দিতে হল ইয়াকুবের জালে বন্দি হয়ে। একদিন সবাই বুঝতে পারল দরিয়া বিবি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেছে। পুত্র মোনাদির বিধাবা মায়ের বাড়ন্ত শরীর দেখে লজ্জায় বাড়ি থেকে চলে যায়। তারপর একদিন দরিয়া বিবি নিজের প্রয়োজনে গভীর রাতে নিজেই ধাত্রী এবং প্রসূতি হয়ে একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। এ সবকিছুর অন্তরালে জননী হিসেবে দরিয়া বিবির উপলব্ধিকেই শওকত ওসমান গৌরবের করে তুলেছেন।

> "দরিয়া বিবি প্রথমে শিশুকে বুকে তুলিয়া লইল। হয়ত তাকে চাপিয়াই বসিয়া থাকিত। শিশুর চিৎকারে খেয়াল হয়। এই সাবধান বাণীর জন্য দরিয়া বিবি বড় কৃতজ্ঞ সজল চোখে শিশুর দিকে তাকাইল; তারপর গামলায় গোসলের সব খুঁটিনাটি সম্পন্ন করিল। অতপর শয্যার ব্যবস্থা। কয়েকটি রঙীন কাঁথা দরিয়া-বিবি বিছাইল ও দুইটী কাঁথা মুড়িয়া নবজাতককে শোয়াইয়া দিল, সে নিজে তখনও দিগ্বসনা। তাড়াতাড়ি নিজে পরিষ্কার হইয়া তার নবতম অতিথিকে মাই খুলিয়া দিল। কি সুন্দর চুক চুক শব্দ হয়। কি মোটাতাজা গৌর রং শিশু। দরিয়া-বিবি উম দিতে থাকে। শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ কয়েকবিন্দু

Dhaka University Institutional Repository

> অশ্রু ঝরিয়া পড়িল অলক্ষিতে ... "বাইরে পৃথিবী সুপ্ত। এখানে গ্রাম্য রান্না ঘরের বুকে কি গভীর প্রশান্তি। পুত্র ও জননী পরস্পরের সান্নিধ্যে পৃথিবীকে ভুলিয়া গিয়াছে। ... ভোর হইয়া আসিয়াছে। দরিয়া-বিবি মনে মনে শুধু ভাবিল, ভোর হয়ে এসেছে। ভাল কথা। একটু পরে সকাল হবে। দরিয়া-বিবি নবজাতকের দিকে অপলক চাহিয়া বারকয়েক চুম্বন করিল।"[১৯]

সত্যিই কি ভোর হয়ে এসেছিল? তারপর কি সকালের সোনালি রোদ্দুর দেখতে পেয়েছিল দরিয়া বিবি? তার আগেই যে অন্ধকারের বুক চিরে ভোরের আলো ফুটছিল সেই অন্ধকারে সে গোয়ালঘরে গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। বেঁচে থাকার গ্লানি তাকে জীবনের কাছে পরাজিত করেছে। বুকের কাছে নবজাতক সন্তানকে পেয়েও বুকে ভরে তাকে আদরমাখা স্নেহের পরশ দিতে তার কি কোথাও নিজেকে অপবিত্র লেগেছিল? দরিয়া বিবি যে সমাজব্যবস্থার শিকার তা কি আজ মিথ্যে হয়ে গেছে? শওকত ওসমান এভাবে গভীর উপলব্ধি ও অনুভূতির চমৎকার চিত্রায়ণ করেছেন দরিয়া বিবির মধ্য দিয়ে। অবস্থার বাস্তবতায় নিঃসন্তান হাসুবৌ নবজাতককে মাতৃস্নেহে বুকে তুলে নিয়েছে। মোনাদির মহেশডাঙ্গায় ফিরে এসেছে। কাহিনীর শেষাংশে দেখি মায়ের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মায়ের প্রতি সেই চিরন্তন শ্বাশ্বত অনুভূতির প্রকাশ

> "... তবু চক্ষুর পানী আর রোধ করিতে পারেনা। তার বুকে চাড়া দিয়া ওঠে বেদনার রাগ-রাগিনীর তোড় মুখর ঝঙ্কার। অস্ফুট কণ্ঠে সে বলে, 'মা গো তোমার বুকে একটু ঠাঁই দিও।' মোনাদির হঠাৎ ডুকরাইয়া উঠিল, আবেগ আর রোধ করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য।"[২০]

উপন্যাসটির প্রতিটি চরিত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখবো অসাধারণ দক্ষতায় শওকত ওসমান মানুষের ভেতর ও বাইরের দিকটি উন্মোচন করেছেন অত্যন্ত গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে । চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশে তিনি তাঁর চিন্তাশীলতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন সর্বাগ্রে। এক্ষেত্রে উপন্যাসের প্রগতিশীল চরিত্র চন্দ্র কোটালের কথা উল্লেখ করতে হয়। গান পাগল এই মানুষটির অন্যতম গুণ হল সে অভাবকে বোঝে। তাই নিজেকে এবং অন্যকেও রক্ষা করতে চায় এর কবল থেকে। সামাজিকতা ও সহমর্মিতা দিয়ে সে মানুষের উপকারে এগিয়ে আসে। নিজের মত করেই যে কোন ঘটনার কার্যকারণকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা সে রাখে এবং নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে। মাতাল হলেও সাম্প্রদায়িকতার অন্তর্নিহিত সত্য সে বুঝতে পারে। সে-ই দরিয়া বিবির দুর্দিনে সর্ব প্রথম এগিয়ে আসে অনাথ সন্তানদের সাহায্য করতে।

শওকত ওসমান উপন্যাসের মূল চরিত্র দরিয়া বিবিকে এক জন মা হিসেবে, একজন নারী হিসেবে গভীর ভাবে তলিয়ে দেখেছেন এবং শিল্প দক্ষতায় তার জীবনবাস্তবতাকে রূপায়িত করেছেন। হয়তো দরিয়া

Dhaka University Institutional Repository

বিবি আত্মহত্যা না করে জীবনসংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে সন্তানদের সাহচার্যে জননী হয়ে দায়িত্ব পালন করতে পারতো। কিন্তু তার আত্মগ্লানি তার বেঁচে থাকার বাসনাকে বাস্তবায়িত হতে দেয় নি। এই সমাজ-সংসারে জীবনসংগ্রামের বিপরীতে এই সমাজ সত্যের প্রতিফলনও দেখা যায়। দরিয়া-বিবির নামে গ্রামের একজন অতি সাধারণ নারীর মধ্য দিয়ে শওকত ওসমান জীবন সত্যের যে স্বাদ আমাদের দিয়েছেন তা সত্যিই গভীর ব্যঞ্জনাময়। "মানুষ দুর্ভাগ্য এবং সৌভাগ্যক্রমে যে কর্মেই নিযুক্ত থাকুক না কেন, অথবা যে দায়-দায়িত্বে সে নিপীড়িত হোক না কেন, তার নিজস্ব সংসার গোত্রের মধ্যে সে যে একজন মানুষ একথা শওকত ওসমান বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।"[২১]

দরিয়া বিবির ট্র্যাজেডির মূলে আছে দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কারণেই তার সম্ভ্রমহানি আর সম্ভ্রমহানির কারণেই তার আত্মহত্যা। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে জীবন চলার পথ দরিয়া-বিবির সুগম হয়নি। ফলে আত্মসম্মানবোধ থাকা সত্ত্বেও সে জীবনের প্রয়োজনে ইয়াকুবের লাম্পট্যের কাছে তার চারিত্রিক দৃঢ়তাকে ধরে রাখতে পারে না। এক দিকে তার জননীসত্ত্বা অন্য দিকে আত্মদংশন, পদে পদে তাকে জটিল সামাজিক সমস্যার কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। মাতৃস্নেহের অন্তরালে তার মধ্যে অবাঞ্ছিত সন্তানের দায়িত্ব ভাবিয়ে তোলে। সে বিচলিত বোধ করে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায়। গ্লানিময় মাতৃ পরিচয় তার সন্তানরা স্বীকার করবে কি না এই চিন্তায় শেষ পর্যন্ত দরিয়া জীবন থেকে পালিয়ে বেঁচেছে। দরিয়া বিবির চোখ দিয়ে শওকত ওসমান যে সমাজকে তুলে ধরেছেন তা একটি বিশেষ সময়ের গ্রামীণ জীবনের প্রবাহমান ঘটনার প্রতিফলন। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র যেমন শৈরমী, মোনাদির, আমজাদ, ইয়াকুব প্রত্যেকেরই পারস্পরিক একটা সম্পর্ক রয়েছে উপন্যাসের পরিণতির ক্ষেত্রে। বিশেষ করে ইয়াকুবের মত চরিত্র আজও এই একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের সমাজে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। প্রসঙ্গক্রমে সর্দার জয়েনউদদীনের উক্তিটি উল্লেখ করা যেতে পারে- "উপন্যাসকে বাস্তবধর্মী হতেই হবে। উপন্যাস রচনার এই যে আন্তর্জাতিক মৌলিক সূত্র তাই-ই পূর্ব পাকিস্তানি ঔপন্যাসিকদের মানস। তারা ধর্মীয় রাষ্ট্রীয় বা অন্য কোন আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে গণমুখী বা মানব কল্যাণময়ী বাস্তবধর্মী সাহিত্য সৃষ্টির বেদনায় সতত বিক্ষুব্ধ।"[২২]

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে জননী স্বার্থক। লেখক হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক উল্লেখ করেছেন গ্রামজীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও শাসকগোষ্ঠীর মানবিক রুচির কথা স্মরণ রেখে। কোন চরিত্রের প্রতি তাঁর অন্ধত্ব নেই। প্রতিটি চরিত্র নিজের মত করেই বিকশিত। আজহার শান্তিপ্রিয় দরিদ্র কৃষক। সে ভাগ্যের খেলায় বার বার হেরে যায়। হেরে গিয়েও সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে কঠিন বাস্তবতায়। তার জীবনমুখী

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রামী চেতনার বিকাশ উপন্যাসে ইতিবাচক ভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসের অন্যতম সংগ্রামী চরিত্র আশেকজান। সে আজহারের দূর সম্পর্কের খালা। অল্প দৃষ্টি, নিরাশ্রয়। কোন রকম আজহারের বাড়িতে মাথা গুজে থাকে। ঈদ, মোহর্‌রম বিভিন্ন পর্বের সময় অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থের কাছ থেকে খয়রাৎ, জাকাত নিয়ে কোনরকমে দিনাতিপাত করে। বৃদ্ধ বয়সে তার জীবন সংগ্রামের যে চিত্র পাওয়া যায় বাংলাদেশের গ্রামীণ বাস্তবতায় অনুরূপ অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। উপন্যাসের আরেকটি সংগ্রামী চরিত্র শৈরমী বাগ্‌দীর। বিধাবা অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র পঙ্গু জওয়ান সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাকে নিতে হয়েছে। গ্রামে ঘুঁটে দিয়ে, শাক বিক্রি করে, কারও বাজার সওদা করে কোন রকম জীবিকা নির্বাহ করে সে। উপন্যাসে তাকে দরিয়া বিবির সমব্যথি হিসেবে পাওয়া যায়। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও সে দরিয়া বিবির বন্ধকী পিতলের কলস ফিরিয়ে দিয়ে তার সততা ও সহমর্মিতা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দরিয়া বিবি আমাদের সারা বাংলার নিপীড়িত নারী জাতির প্রতীক। শওকত ওসমান উপন্যাসে গ্রাম বাংলার এক সাধারণ রমণীর নীরবে সয়ে যাওয়া সর্ব প্রকার নিপীড়নের বর্ণনা দিয়েছেন। যে কারণে একজন দরিয়া-বিবির কাহিনী হয়ে উঠেছে অসংখ্য দরিয়া বিবির গল্প। দরিয়া বিবির অস্তিত্ব সংগ্রামের নিরন্তর প্রচেষ্টার মধ্যে সর্বপরি মাতৃত্বের চেতনায় মানবতার গৌরবই এই উপন্যাসের মূল কথা হিসেবে লেখক তুলে ধরেছেন। মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করে ইয়াকুবদের মত নিপীড়নকারীদেরকে নির্বাক করে দিয়ে নীরব প্রতিবাদের এক জ্বলন্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে দরিয়া বিবি।

হাজার বছর ধরে (১৯৬৪)

হাজার বছর ধরে উপন্যাসের বিষয় আবহমানকালের গ্রামবাংলার জনজীবন। যা জহির রায়হান নিগূঢ় অনুভূতি ও মননশীলতার সাথে তুলে ধরেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র সমূহ জীবনমুখী। সমাজ ও শ্রেণী সচেতন শিল্পী হিসেবে জহির রায়হানের সাফল্য এখানেই। রোমান্টিক এবং মায়াময় হৃদয়ের মাধুরী দিয়ে তিনি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের দৈনন্দিন চাওয়া-পাওয়া ফুটিয়ে তুলেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। খেটে খাওয়া মানুষের সুখ-দুঃখ এবং বাংলার মমতাময়ী নারী তার সাহিত্যের উপজীব্য।

Dhaka University Institutional Repository

লেখক উপন্যাসের প্রধান দুই চরিত্র মন্তু এবং টুনির মাধ্যমে হাজার বছরের গ্রাম-বাংলার অতি সাধারণ মানুষের স্বপ্নের ছবি চিত্রিত করেছেন। সমগ্র উপন্যাস তাঁর রোমান্টিক মানসিকতার আশ্রয়ে পরিচালিত এবং এর মধ্য দিয়েই তিনি মানুষের আশা-আকাংক্ষার বিচিত্র রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। "সময় ও সমাজের চলিষ্ণুতার পটভূমিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে গভীরতর অর্থে কোন গুনগত পরিবর্তন ছিল অনুপস্থিত। ...আর্থ-সামাজিক কাঠামোর গুণগত পরিবর্তনহীনতা বৃহত্তর গ্রামীণ জীবনকে সেই প্রথাজীর্ণ, নিস্তরঙ্গ অবকাঠামোর মধ্যে করে রেখেছে অবরুদ্ধ। জহির রায়হান অন্তরঙ্গভাবে জীবনের এই স্বরূপ সত্য উন্মোচন করেছেন 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিচিত্র অন্তঃঅসঙ্গতির মধ্যেও তিনি সন্ধান করেছেন জীবনের চিরায়ত আবেগী স্পন্দন।"[২৩]

টুনি ও মন্তর ভালবাসা বাস্তবে কোন রূপ নিতে ব্যর্থ হলেও তাদের পরকীয়া প্রেমের সারল্য প্রকাশিত হয়েছে অকপট এবং অকৃত্রিম ভাবে। টুনির পরিণতি জহির রায়হান বহুমাত্রিক বিশিষ্টতায় বিন্যস্ত করেছেন। এই দুঃখী বাংলার গ্রামীণ বাস্তবতায় দারিদ্র্যের সংসারে কত রকম জীবন সংগ্রাম করতে হয় তার গভীর প্রতিধ্বনি রয়েছে এই উপন্যাসে। গরিব ঘরের মেয়ে টুনিকে অল্পবয়সে বুড়ো মকবুলের সংসারে একাধিক সতীনের মধ্যে সংসার করতে আসতে হয়। বুড়ো মকবুলের বাড়ীতে আশ্রিত মন্তুকে কেন্দ্র করে টুনির আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ মন্তুর প্রতি টুনির দুর্নিবার আকর্ষণের পরিচয়বাহী । সমাজের চোখে নিষিদ্ধ হলেও হৃদয়ের টানে একে অন্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। টুনি ও মন্তুর আর্থ-সামাজিক অবস্থান এমন ছিল যে তারা তাদের আবেগিক সম্পর্ককে চূড়ান্ত পরিণতির বাস্তব রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু প্রকৃতির আশ্রয়ে বনে জঙ্গলে, নদীর পারে, বিলের ধারে গল্প করে জ্যোৎস্না রাতে হাসি ছড়িয়ে ভালবাসার অনুভূতিকে বাস্তবে রূপায়ণ করেছে কিন্তু সামাজিক শৃঙ্খল ভাঙতে পারেনি।

> "... ঈষৎ আলোর পথ চিনে নিয়ে চুপি চুপি আসে ওরা। রাতের শিশিরে ভেজা ঘাসের বিছানা মাড়িয়ে ওরা আসে ধীরে ধীরে। টুনি ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে থাকে। মন্তু নেবে যায় পানিতে। তারপর অনেকগুলো শাপলা তুলে নিয়ে, অন্য সবাই এসে পড়ার অনেক আগে সেখান থেকে সরে পড়ে ওরা। ... মন্তু বলে, বুড়ো যদি জানে তোমারে আমারে মাইরা ফালাইবো। টুনি বলে, ইস, বুড়ার নাক কাইটা দিমু না। নাক কাইটলে বুড়ো যদি মইরা যায় ? মরলেই তো বাঁচি। বলে ফিক করে হেসে দেয় টুনি, বলে, পাখীর মত উইড়া আমি বাপের বাড়ী চইলা যামু। বলে আবার হাসে সে, সে হাসি আশ্চর্য এক সুর তুলে পরীর দীঘির চার পাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়।"[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

তিন বউকে নিয়ে বুড়ো মকবুলের সংসার। কিন্তু বউদের বসিয়ে খাওয়ানোর মতো জমিজমা নেই তার। বউদের আয় দিয়েই তার সংসার চলে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকে কতরকম অমানবিকভাবে ব্যবহার করা হয় তার উদাহরণও সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেন জহির রায়হান।

> "ফসলের দিনে সবাই যখন গরু দিয়ে ধান মাড়ায় তখন তিন বউকে লাগিয়ে ধান মাড়ানোর কাজটা সেরে ফেলে ও। বর্ষা পেরিয়ে গেলে বাড়ীর উপরে যে ছোট জমিটা রয়েছে তাতে তিন বউকে কোদাল হাতে নামিয়ে দেয় মকবুল। নিজেও সঙ্গে থাকে । মাটি কুপিয়ে কুমড়ো আর সীমের গাছ লাগায়। ... তিন বউ যখন ঝগড়া বাঁধিয়ে চুল ছেঁড়ার লড়াই শুরু করে তখন বড় বিস্বাদ লাগে ওর। হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে তিনজনকে সমানে মারে। কাউকে ছাড়াছাড়ি নেই।"[২৫]

বুড়ো মকবুলের অমানবিকতার আরও বিশদ বর্ণনা আমরা পাই-

> "জোড়া বউকে ঢেকির উপর তুলে দিয়ে রাত জেগে ধান ভানে বুড়ো মকবুল। পিদিমের শিখাটা ঢেঁকির তালে তালে মৃদু কাপে । মকবুল ধমকে ওঠে বউদের, কি, গায়ে শক্তি নাই? এত আস্তে ক্যান। আরো জোরে চাপ দাও না হুঁ। এমন ভাবে গর্জে ওঠে মকবুল যেন মাঠে লাঙ্গল ঠেলতে গিয়ে রোগা লিকলিকে গরু, জোড়াকে ধমকাচ্ছে সে । হু হট হট । হুঁ আরো জোরে। আরো জোরে।"[২৬]

এই কঠিন বাস্তবতায় অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও টুনি নিজের ভালবাসা সম্পর্কে খুবই সচেতন । টুনি যখন দেখে মন্তুর সাথে আম্বিয়ার বিয়ে ঠিক হতে যাচ্ছে তখন সে কৌশলে মকবুলকে বুঝিয়ে দেয় যে আম্বিয়া অনেক সম্পত্তির মালিক তাই মকবুলেরই উচিত হবে আম্বিয়াকে বিয়ে করা। মকবুল টুনির এই প্রস্তাব তার স্বভাব-মতো লুফে নেয়। পরিণতিতে তার অন্য দুই স্ত্রীর অমতের জন্য তাদের তালাক দেয় আর নিজেও আবুলের পিঁড়ির আঘাতে আহত হয়। এ অবস্থায় টুনি স্বামীর সেবা-যত্ন করেও তাকে বাঁচাতে পারে না। কিছুদিন পর মকবুলের মৃত্যু হয়। টুনির করুণ পরিণতিই *হাজার বছর ধরে* উপন্যাসটিতে ট্র্যাজিডির আবেশ দিয়েছে।

জহির রায়হান খোলা চোখ আর মুক্ত মন নিয়ে এই উপন্যাসে জনজীবনকে তুলে ধরেছেন সুখে, দুঃখে, আনন্দ, বেদনায়, মহামারীর মধ্য দিয়ে। ঠিক যেন একটা গ্রামীণ রূপকথা । গ্রামজীবনের সমগ্র চেহারা সহজভাষায় যেন রূপকথার গল্পের রূপ নেয়-

> "উঠোনে বেশ বড় রকমের জটলা বেধেছে একটা । মাটিতে চাটাই বিছিয়ে বসেছে সবাই। আর তার মাঝখানে একটি পিদিমের আলোতে বসে পুঁথি পড়ছে সুরত। ... আকাশে যখন জোছনার বান ডাকে। ভরা চাঁদ খিলখিলিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

হাসে। দক্ষিণের মৃদুমন্দ বাতাস অতি ধীরে তার চিরুনি বুলিয়ে যায় গাছের পাতায় পাতায়। ... গ্রামের সবাই সারা দিনের কর্মব্যস্ততার কথা ভুলে গিয়ে হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেয়। নিঃশব্দ নিঝুম রাতে কুঁড়েঘরের ছায়াগুলো ধীরে হেলে পড়ে উঠোনের মাঝখানে। তখন সুর করে পুঁথি পড়ে সুরত আলী। গাজী কালুর পুঁথি। জেলুয়া সুন্দরীর পুঁথি।"[২৭]

শীতেই আম্বিয়ার সাথে মন্তুর বিয়ের খবর টুনিকে বিচলিত ও ব্যথিত করলে সে শেষ পর্যন্ত মন্তুকে অনুরোধ করে তাকে বাপের বাড়ি পৌঁছে দিতে। মন্তুর নৌকায় বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় টুনি আর কোন দিন এখানে ফিরে আসবে না জেনে একে একে সবার কাছ থেকে বিদায় নেয়। পথে মনোয়ার হাজীর বাড়ী এসে মন্তু পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টুনিকে বিয়ে করে সেখানে যাওয়ার প্রস্তাব দিলে জলভরা চোখে টুনি প্রত্যাখ্যান করে সেই প্রস্তাব।

শেষ পর্যন্ত মন্তু আম্বিয়াকে বিয়ে করে পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পেলেও টুনির শূন্য হৃদয়ে বাপের বাড়ি ফিরে যাাওয়ার মুহূর্ত সত্যিই বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে। তার বুদ্ধিমত্তায় আমরা মুগ্ধ হলেও তার কষ্ট আমাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। উপন্যাসের গ্রামীণ জীবন সুরত আলী, বুড়ো মকবুল, আবুল, রশীদ, সালেহা, আমেনা, ফাতেমা, হালিমা, করিম শেখ, আম্বিয়া প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে বাস্তব রূপ পেয়েছে। বুড়ো মকবুলের প্রতিবেশী আবুলের কথা এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। আবুলের পূর্বের দুই বউই স্বামীর নির্যাতনে প্রাণ দিয়েছে। ঘরে তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী হালিমা। আবুল কারণে অকারণে তার গায়েও হাত তোলে। বউকে মেরে সে একটা পৈশাচিক আনন্দ পায়। এ যেন তার একটা নেশা। গ্রামীণ বাস্তবতায় আবুলের মতো অমানুষের হাতে যুগে যুগে নারীদের কতরকম নির্মমতার স্বীকার হতে হয়, সেই হৃদয়স্পর্শী ঘটনা উপন্যাসে অল্প সময়ের জন্যে হলেও জহির রায়হান গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন।

সুরত আলীর ছেলে বাবর পুঁথি পড়ার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে করুণ বিলাপের মধ্য দিয়ে, এমন একটা বাস্তবতায় উপন্যাস শেষ হয়েছে। পল্লী-গৃহবধু টুনির জীবনের সমাজ বাস্তবতা যেন আজও সত্যি বলে মনে হয়। বর্তমান গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় টুনির মত গৃহবধু বিরল নয়। তাদের হৃদয়ের না বলা অনেক আবেগ অনুভূতির বাস্তব ছবিই যেন জহির রায়হান টুনির মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। জহির রায়হানের জীবন বোধের গভীরতা উপন্যাসটিকে ভিন্নমাত্রা দান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

হয়। গৃহবধু নবিতুনকে জীবনের প্রথম জীবিকার সন্ধানে ঘরের বাইরে পা রাখতে হয়। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের সাথে দুঃখজনক অভিজ্ঞতাও লাভ করে সে। চৌধুরী বাড়ীতে ছোট চৌধুরীর নজর এবং কথাবার্তার ধরন নবিতুনের ভাল লাগে না। চৌধুরী বাড়ীর অনেক লাঞ্ছনা অপমানের পরও একটু ভাতের জন্য সে নীরবে সব মেনে নেয়।

> "কিরে নবিতুন, তোর সারেংয়ের খবর টবর পেলি? চোখে মুখে স্বরে কুৎসিত এক ইঙ্গিত টেনে শুধায় ছোট চৌধুরী । জড়োসড়ো ঘোমটা টেনে পাশ কাটিয়ে চলে যায় নবিতুন। কথা যেমন বাঁকা, মুখ যেমন খারাপ ছোট চৌধুরীর তেমনি নজরটাও তার বড় বদ। কেমন বদ চোখে তাকায় ছোট চৌধুরী। হিম হয়ে যায় নবিতুনের গা টা। বড় ভয় করে ওর।"[২৯]

একই গ্রামের লুন্দর শেখ, কদমের দূর সম্পর্কের মামা। তার লোভাতুর দৃষ্টি পড়ে নবিতুনের উপর। নানা প্রলোভনে যখন নবিতুনকে ভোলাতে ব্যর্থ হয় তখন একদিন --

> "লুন্দর শেখের লুব্ধ চোখ লেহন করে যায় সারেং বৌর রূপের সুধা। কিন্তু সেদিকে হুঁশ নেই নবিতুনের। ... দুমড়ানো নোটগুলো ছড়িয়ে পড়ল এদিক ওদিক।
>
> ... দেখলে? দেখ দেখ মাগীর তেজ। সাক্ষী রইলে তোমরা- টাকা দিলাম, টাকা নিলে না মাগীটা। ... তা এখন ওর কদমেরই বা দরকার কি? টাকারই বা কি ঠেকা? 'লাং' এর তো আর অভাব নেই, টাকারও কমতি নেই। ... কদম যতই দেরী করবে আসতে ততই ভাল। ... চৌধুরী বাড়ির বান্দীগিরিতে বড় মধু গো, বড় মধু। ... কথাগুলোর মতোই কুৎসিত বিসদৃশ এক হাসি লুন্দর শেখের মুখে। কিন্তু চোখে তার কামনার বহ্নি। দেহময় কি এক আক্রোশ লোলুপতার তপ্ত প্রবাহ।"[৩০]

এভাবেই গ্রামের মানুষের সামনে নবিতুনকে অপমান করে লম্পট লন্দুর শেখ। নবিতুনের দৈনন্দিন সংগ্রামের আরো একবার হুমকির মুখে পড়েছিল যখন নবিতুন অন্যের ধান ভেনে মা ও মেয়ের অন্নের সংস্থান করতো, যন্ত্রসভ্যতার প্রসারের কারণে সেই প্রচেষ্টাও বন্ধ হয়ে যায়।

> "সেই যে কোরা নিয়ে গেল মুন্সী বাড়ি এখনো ফেরে না কেন আক্‌কি? ... যেন মস্তবড় অপরাধ করেছে তেমনি কুণ্ঠিত পায়ে কাছে এসে দাঁড়ায় আক্‌কি। ওর হাতের শূন্য কোরাটার দিকে তাকিয়ে যেন ছাঁৎ করে ওঠে নবিতুনের বুকটা।
>
> "কিরে, ধান আনলি না ! শুধায় নবিতুন।

Dhaka University Institutional Repository

সারেং বৌ (১৯৬২)

শহীদুল্লা কায়সারের প্রথম উপন্যাস *সারেং বৌ* গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা রূপায়ণে বিশিষ্টতার দাবিদার। সামাজিক পরিবর্তনের বহুমূখী প্রভাব এ উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের সংগ্রামমুখর জীবনের এক অফুরন্ত প্রচেষ্টার কথা এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বিষয়। সারেং বৌ নাম থেকেই বোঝা যায় জাহাজে চাকরিরত সারেংদের জীবন সংগ্রাম বর্ণিত হয়েছে এই উপন্যাসে। তাদের জীবনের দুঃসাহসিকতা, রোমান্স ও সংগ্রামের পাশাপাশি দারিদ্র্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীণ জীবন এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। মন্তু সারেং বাণিজ্যিক জাহাজে দীর্ঘ ত্রিশ বছর কর্মরত থেকে জাহাজ পরিচালনায় অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ হয়ে ওঠে। লেখাপড়া কম জানলেও সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে মুখে মুখেই দিকনির্ণয়সহ অন্যান্য যান্ত্রিক কৌশল টুকটাক শিখে নিয়েছে। বিচিত্র গোপন কেনাবেচার সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে সে ভাগ্যের পরিবর্তন এনেছে। বন্ধুপুত্র কদমকে দিয়েও তার অজান্তে নিষিদ্ধ মাল পাচার করে। বকশিস দেয়ার সময়ই কেবল কদম সেটা বুঝতে পারে। 'বন্দরবালাদের' সাথে মধ্য বয়সেও মদ খেয়ে অবাধে মিশতে সে দ্বিধা করে না। এমন কি পুত্রতুল্য কদমকেও বন্দরবালার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহ দিতে লজ্জা পায় না। অবশ্য কদমের মঙ্গলচিন্তাও করে মন্তু। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মজেল সারেং এর সন্তান কদম ছোটবেলা থেকেই সৎ থাকার প্রয়াসে মৃত পিতার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। জাহাজে সুকানি হিসেবে কর্মরত ছিল সে।

> "যেদিন থেকে জাহাজের কামে ঢুকেছে কদম সেদিন থেকেই ওর পরিচয় বন্দরে বন্দরে অসংখ্য গোপন পথের এই বিচিত্র কেনা বেচার সাথে।"[২৮]

কিন্তু নিরীহ ভাল মানুষ কদম অবৈধ উপার্জন কিংবা বন্দরবালার সহচার্য কোনটাই ভোগ করতে রাজি নয়। মদও স্পর্শ করে না সে। তারপরও দেখা যায়, জব্বার সারেং কদমের অজান্তে তার পকেটে নিষিদ্ধ মাল পাচার করে। নিস্পাপ কদম বন্দর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে পুলিশ আহত হলে তাকে কয়েক বছর জেল খাটতে হয়। অন্যদিকে উপকূলবর্তী বামনছড়ি গ্রামে কদমের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী নবিতুন ও কন্যা আক্‌কি জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। অর্ধাহারে -অনাহারে ও নানা দুর্বিপাকের মধ্যে দুঃসহ জীবনযাপন করে তারা। স্বামীর রেখে যাওয়া টাকায় প্রথম কিছুদিন চললেও দীর্ঘদিন কদমের টাকা ও চিঠি না পেয়ে নবিতুন চৌধুরী বাড়ীতে ঝি এর কাজ নিতে বাধ্য

Dhaka University Institutional Repository

হয়। গৃহবধু নবিতুনকে জীবনের প্রথম জীবিকার সন্ধানে ঘরের বাইরে পা রাখতে হয়। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের সাথে দুঃখজনক অভিজ্ঞতাও লাভ করে সে। চৌধুরী বাড়ীতে ছোট চৌধুরীর নজর এবং কথাবার্তার ধরন নবিতুনের ভাল লাগে না। চৌধুরী বাড়ীর অনেক লাঞ্ছনা অপমানের পরও একটু ভাতের জন্য সে নীরবে সব মেনে নেয়।

> "কিরে নবিতুন, তোর সারেংয়ের খবর টবর পেলি? চোখে মুখে স্বরে কুৎসিত এক ইঙ্গিত টেনে শুধায় ছোট চৌধুরী । জড়োসড়ো ঘোমটা টেনে পাশ কাটিয়ে চলে যায় নবিতুন। কথা যেমন বাঁকা, মুখ যেমন খারাপ ছোট চৌধুরীর তেমনি নজরটাও তার বড় বদ। কেমন বদ চোখে তাকায় ছোট চৌধুরী। হিম হয়ে যায় নবিতুনের গা টা। বড় ভয় করে ওর।"[২৯]

একই গ্রামের লুন্দর শেখ, কদমের দূর সম্পর্কের মামা। তার লোভাতুর দৃষ্টি পড়ে নবিতুনের উপর। নানা প্রলোভনে যখন নবিতুনকে ভোলাতে ব্যর্থ হয় তখন একদিন --

> "লুন্দর শেখের লুব্ধ চোখ লেহন করে যায় সারেং বৌর রূপের সুধা। কিন্তু সেদিকে হুঁশ নেই নবিতুনের। ... দুমড়ানো নোটগুলো ছড়িয়ে পড়ল এদিক ওদিক।
>
> ... দেখলে? দেখ দেখ মাগীর তেজ। সাক্ষী রইলে তোমরা- টাকা দিলাম, টাকা নিলে না মাগীটা। ... তা এখন ওর কদমেরই বা দরকার কি? টাকারই বা কি ঠেকা? 'লাং' এর তো আর অভাব নেই, টাকারও কমতি নেই। ... কদম যতই দেরী করবে আসতে ততই ভাল। ... চৌধুরী বাড়ির বান্দীগিরিতে বড় মধু গো, বড় মধু। ... কথাগুলোর মতোই কুৎসিত বিসদৃশ এক হাসি লুন্দর শেখের মুখে। কিন্তু চোখে তার কামনার বহ্নি। দেহময় কি এক আক্রোশ লোলুপতার তপ্ত প্রবাহ।"[৩০]

এভাবেই গ্রামের মানুষের সামনে নবিতুনকে অপমান করে লম্পট লন্দুর শেখ। নবিতুনের দৈনন্দিন সংগ্রামের আরো একবার হুমকির মুখে পড়েছিল যখন নবিতুন অন্যের ধান ভেনে মা ও মেয়ের অন্নের সংস্থান করতো, যন্ত্রসভ্যতার প্রসারের কারণে সেই প্রচেষ্টাও বন্ধ হয়ে যায়।

> "সেই যে কোরা নিয়ে গেল মুন্সী বাড়ি এখনো ফেরে না কেন আক্‌কি? ... যেন মস্তবড় অপরাধ করেছে তেমনি কুণ্ঠিত পায়ে কাছে এসে দাঁড়ায় আক্‌কি। ওর হাতের শূন্য কোরাটার দিকে তাকিয়ে যেন ছাঁৎ করে ওঠে নবিতুনের বুকটা।
>
> "কিরে, ধান আনলি না ! শুধায় নবিতুন।

Dhaka University Institutional Repository

না, ভূইয়ার হাটে কল বসেছে। এখন থেকে সেই কলেই নাকি সবাই ধান ভানবে। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে যায় আক্‌কি।"[৩১]

বেঁচে থাকার নূন্যতম চহিদা পূরণে প্রায় ব্যর্থ নবিতুন কদমের চিঠি, টাকা ও সংবাদ বঞ্চিত হওয়ায় অস্তিত্বের অন্ধকার দীর্ঘায়িত হতে থাকে। ফলে আরোপিত দারিদ্র্য তাকে সীমাহীন অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেয়। এ অবস্থায় নবিতুনের অসহায়ত্ব ও দারিদ্র্যের সুযোগ নেয় হিংস্র লুন্দর শেখ। চৌধুরী বাড়ী থেকে কাজ শেষে ফেরার পথে নবিতুনকে পাটক্ষেতের মধ্যে আক্রমণ করে। কিন্তু সর্বশক্তি দিয়ে নবিতুন প্রতিরোধ করে লুন্দর শেখের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়।

দীর্ঘ কারাবাসের পর কিছু উপার্জন করে কদম যখন গ্রামে ফিরে আসে তখন লুন্দর শেখ ও পোস্ট মাস্টার ষড়যন্ত্র করে নবিতুন সম্পর্কে কদমের মনে সন্দেহের বিষ ঢুকিয়ে দেয়। কদম স্ত্রীর সততার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে তাকে অত্যাচার করে। এক সময় বৈরী প্রকৃতির পটভূমিতে কদম প্রকৃত সত্য অবহিত হয়। প্রলয়ংকরী সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে গ্রামবাসীদের সঙ্গে মরতে মরতে বেঁচে যায় একমাত্র সর্বহারা এই দম্পতি। তাদের একমাত্র সন্তানটিও প্রবল স্রোতে ভেসে যায়। শপথ নেয় তারা নতুন জীবন গড়ার।

এই অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতায় নবিতুনকে যেন নতুন করে সৃষ্টি করেছেন শহীদুল্লা কায়সার। "মানবীয় বিশ্বাস সংস্কারের প্রথাগত রূপের বিপ্রতীপে নবজীবনপ্রাপ্ত কদম ও নবিতুনকে উপস্থাপন করেছেন তিনি। তৃষ্ণার্ত মৃতপ্রায় কদমের মুখে তুলে দেয় নবিতুন নিজের স্তন ... উপন্যাসের শেষে উচ্চারিত হয়েছে মানুষের অপরিমেয় জীবনীশক্তি এবং সম্ভাবনাময় সম্মুখে সংগ্রামের প্রাণমন্ত্র।"[৩২]

... কদম বলল, আর একটু জিরিয়ে নেরে নবিতুন। হাঁটতে হবে অনেক দুর।"[৩৩]

বিষয় বিন্যাসে ও প্রকরণের দিক দিয়ে *সারেং বৌ* গ্রামীণ আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সারেং জীবনের যাযাবর স্বভাবের বিপরীতে প্রতীক্ষাকাতর, সম্ভ্রম ও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামশীলতার মধ্য দিয়ে নবিতুনের চরিত্র হয়ে উঠেছে গৌরবময়। শহীদুল্লা কায়সার নবিতুনকে ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানের ভিতর দিয়ে অনেকটাই আধুনিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসের শেষাংশে নবিতুনের নবসত্তার উন্মোচন ঔপন্যাসিকের চিরায়ত মানবিক চেতনার পরিচয়বাহী। কদমের পরিবার বিত্তহীন। কদম সামান্য আয়ের চাকরি করে। সে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জেলে গেলে তার পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে। গৃহস্থ চৌধুরী বাড়ীতে

Dhaka University Institutional Repository

ধান ভানার কাজ নেয় নবিতুন। চালকল চালু হলে সে কাজও হারায় নবিতুন। চাকুরিজীবীর ষড়যন্ত্র ও প্রভাবশালীর নারী-লোলুপতা হতদরিদ্র একটি পরিবারের জীবনকে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

কর্ণফুলী (১৯৬২)

আলাউদ্দিন আল-আজাদের রচনাশৈলীর আর এক অনবদ্য উপন্যাস *কর্ণফুলী*। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগে উপন্যাসটি অধিক বাস্তবতা লাভ করেছে। এই উপন্যাসে নদীকেন্দ্রিক জনজীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার এক চিরাচরিত চিত্র রূপায়িত হয়েছে। *কর্ণফুলী* নদীর বুকে ভেসে চলা নৌকার মাঝি থেকে শুরু করে নদী তীরবর্তী জনজীবনের নিখুঁত বর্ণনা আছে উপন্যাসটিতে। সাহিত্যমূল্য বিচারে কর্ণফুলীর শিল্পসাফল্য যাই হোক, আঞ্চলিক জনজীবন রূপায়ণে *কর্ণফুলী* বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

পার্বত্য অঞ্চলের জীবনধারায় পকেটমার ইসমাইলই *কর্ণফুলী* উপন্যাসের নায়ক। জুলি তাকে ভালবেসে ঘর বাঁধতে চাইলেও ইসমাইল সে বিষয়টিকে নিয়ে তেমন করে ভাবেনি। যদিও জুলিকে সে একটি আংটি উপহার দেয়। কাহিনীর এক পর্যায়ে মনে হয়েছে আদিবাসী কন্যা রাঙামিলাকে সে আপন করে পেতে চায়। অবশ্য ঘটনার আকস্মিকতায় রাঙামিলাকে কেন্দ্র করেই তার শুভ বোধোদয় ঘটে। বাঙালি ও আদিবাসীদের দ্বন্দ্ব-সংহতি কাহিনীতে টানটান উত্তেজনা এনে দিয়েছে। উপন্যাসে জীবনের বস্তুঘনিষ্ঠ রূপের পরিচয় পাওয়া যায় এভাবে

> "নামে পাহাড়তলী, কিন্তু পাহাড় একটিও নেই; আছে উঁচু ঢিবি, পাহাড়ের ভেলকির মত, বিশেষত শহরের এলাকায়। রাস্তা থেকে কিছু দূরেই মুটে মজুরদের বস্তি গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি, ঘিঞ্জি খড়ো ঘরের হিবিজিবি। লোকগুলি কঠিন, কালো, সূর্যের আলোকে দেখলে মনে হয় কাক কুকুর মানুষে প্রভেদ খুব বেশি নয়, তফাৎটা শুধু আকৃতির। সারাদিন কলকারখানার জেটিতে গতর খেটে কিছু রাত পর্যন্ত বাইরেই কাটায় এমন মর্দ কম নেই; কিন্তু বস্তির অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফেরে।"[৩৪]

ইসমাইলের দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর দিয়েও রাঙ্গামাটির অন্য বাস্তবতা ধরা পড়ে–

> "মিলের বাঁশ কাটার মেশিনটা আজব জিনিস, যেন রূপকাহিনীর রাক্ষস, প্রচণ্ড শব্দে কাজ করে ... এদের কাছে মানুষের মেহনত তো কিছু নয়? পাহাড়কে বদলাচ্ছে, মাটিকে বদলাচ্ছে, যাদুমন্ত্রের মতো।"[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

এখানে নগরায়ণের ফলে যন্ত্রসভ্যতার উদ্যত থাবা নিস্তরঙ্গ পাহাড়ী জীবনকে কিভাবে বদলে দিচ্ছে ঔপসান্যিক সেটাও তুলে ধরেছেন সচেতন ভাবে। বিপথগামী ইসমাইল শেষ পর্যন্ত সারেং এর চাকুরি নিয়ে নতুন জীবনে প্রবেশ করে। ইসমাইলকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার পর জুলি যেন জীবন সংগ্রামে বাস্তবতার সত্যিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। সন্তানসহ জুলিকে রেখে ইসমাইল জাহাজে জীবিকার সন্ধানে লিপ্ত হয়।

রমজান ও ইসমাইল প্রথম দিকে সমাজের বিকৃত রূপের প্রতিনিধিত্ব করলেও ইসমাইল এই আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। জুলিকে বিয়ের মাধ্যমে ইসমাইলের জীবনবোধ নবমাত্রায় জাগ্রত হয়। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র যেমন, লালচাচা, কেরামত, রমজান, নীলমনি, রাঙামিলা, মনুবিবির মত মানুষ আমাদের সমাজ জীবনে বিচরণ করলেও এই উপন্যাসে তাদের চরিত্রের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দুর্বলতায় পর্যবসিত হয়েছে। শুধুমাত্র সেই তুলনায় জুলির মানসিক অবস্থা, বিবাহিত জীবনে স্বামীর মঙ্গল চিন্তা ও নির্ঝঞ্ঝাট সুস্থ জীবন উপলব্ধি, স্বামীর অত্যাচার ও ভালোবাসাকে বাস্তব দৃষ্টিতে বিবেচনা করা সব মিলিয়ে একটি সাধারণ জীবনাকাঙ্ক্ষার মানবী হিসেবে পূর্ণতা লাভ করেছে। *কর্ণফুলী* নদীকে কেন্দ্র করে পাহাড়ী জীবনকে তুলে আনতে লেখকের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। "এ উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য আমাকে কয়েকবার পার্বত্য অঞ্চলে থাকতে হয়েছিল। এ বিষয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছিল আমার তিনজন উপজাতীয় ছাত্র। আমি ওদের দিয়ে উপজাতীয় ভাষার ব্যবহার যাচাই করে নিতাম। *কর্ণফুলী* উপ ন্যাসের জন্য আমি নিরাপত্তাবন্দী হিসেবে জেল খেটেছি। ... তবে কর্ণফুলী উপন্যাসের নামকরণের তত্ত্ব উদঘাটনে আমাকে উপজাতীয়দের রূপকাহিনী জানতে হয়েছে।"[৩৬] সবকিছু মিলিয়ে বাস্তব অনুসঙ্গের ভিত্তিতে উপন্যাসটি সরল উপস্থাপনায় কর্ণফুলীর তীরবর্তী মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছে ।

কাশবনের কন্যা (১৯৫৪)

বরিশালের একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের ভাষা ও জীবনবোধকে কেন্দ্র করে শামসুদ্দীন আবুল কালাম *কাশবনের কন্যা* (১৯৫৪) উপন্যাসটি রচনা করেছেন। অতিসাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের আবেগ, অনুভূতি, আনন্দ-বেদনা দক্ষ শিল্পীর মতই শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন সুনিপুণ

Dhaka University Institutional Repository

ভাবে। তাই *কাশবনের কন্যা* ঔপন্যাসিকের প্রথম উপন্যাস হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সাধারণ মানুষের জীবনের ছবি উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে এভাবে –

> "রাত্রি দ্বি-প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; তবু গাঙ্গের বুকে মাছ ধরার ধুম তখনও শেষ হইয়া যায় নাই; এদিক ওদিক অগুনতি নৌকা তো ছিলই, তদুপরি ক্রমে ক্রমে আরও দুই চারিখান করিয়া আসিয়া জমিতেছিল।"[৩৭]

উপন্যাসের কাহিনীতে হোসেন ও শিকদার দুই বন্ধু এই নদীতে মাছ ধরে কোনমতে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের চাওয়া-পাওয়া,আবেগ-অনুভূতি দুটি স্বতন্ত্র নারীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। শিকদারের বন্ধু হোসেন কিশোর বেলায় ভালোবাসতো সখিনাকে, পরে সে ভালবাসা অবশ্য বাস্তবরূপ পায় না। হোসেনের স্মৃতিতে মাঝে মাঝে সখিনা এসে হৃদয়কে আলোড়িত করে। একদিন অসুস্থ ছবদার মাঝিকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়ে পুনরায় জড়িয়ে পড়ে ছবদার কন্যা মেহেরজানের সাথে মানসিক সম্পর্কে। মেহেরজানের স্বামী বহু বিবাহে অভ্যস্ত। স্বামীর কাছ থেকে তালাক না পাওয়া মেহেরজান স্বামীর অবহেলায় বাবার বাড়িতেই থাকে। তাই আদর্শবোধের সাথে অনিশ্চিতের ভাবনায় হোসেনের সাথে হৃদয়ের সম্পর্কটাকে সহজভাবেও মেনে নিতে পারে না সে। শেষ পর্যন্ত মেহেরজান ,হোসেনের ভালবাসার স্বীকৃতি জানালে হোসেন আবেগ ও আকুলতাকে উপেক্ষা করে মেহেরজানের তালাকের খরচ উপার্জনের জন্য নৌকায় করে রওয়ানা হয়। বিদায় কালে মেহেরজানকে একটু সোহাগ করতে গেলে-

> "মেহের প্রথমটাই বাধা দিল না: কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু পায়ের কাছে কুকুরটাকে দেখিয়া মনে হইল সেটা হাসিতেছে - ছিঃ। মেহের লজ্জায় শিহরিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি ছটফট করিয়া উঠিল: মা ঐখানে। আমার শরম করতে আছে-ছাড়ো - শিগগীর হোসেনের হাত ছাড়াইয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে আগাইয়া গেল।"[৩৮]

এভাবেই হোসেন প্রেমাবেগে মেহেরজানকে আপন করে পেতে নৌকায় করে রওয়ানা হয় টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। হোসেনের ভালোবাসার প্রকাশ এক্ষেত্রে অনেক সাবলীল। অন্যদিকে হোসেনের বন্ধু শিকদার জোবেদাকে ভালোবাসলেও জোবেদা শিকদারের সংসারের দারিদ্র্যকে মেনে নিতে পারে নি –

> "হ,-তুমি বিয়া করইয়া খাওয়াবা কী আমারে– কেবল গান শুনইয়া তো আর প্যাট ভরবে না। কী আছে তোমার? আমি স্বাদ-আহলাদ করইয়া বাঁচিতে চাই– যাউক–এসব কতা আর আলোচনায় কোনো কাম নাই।"[৩৯]

অবশ্য জোবেদা শিকদারকে উপেক্ষা করে স্বচ্ছলতার আশায় বেশী বয়সের স্বামীর সংসারে সুখী হতে পারেনি। স্বামী শহরে পতিতা নিয়ে থাকে। শ্বাশুড়ীর নির্যাতন ও স্বামীর অত্যাচার বৃদ্ধি পেলে সে

Dhaka University Institutional Repository

আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সর্বোপরি আত্মহত্যা করতে গিয়ে শিকদারের কথা মনে পড়ে তার। সামাজিকতাকে উপেক্ষা করে সে ছুটে আসে শিকদারের কাছে এবং দ্বিধাহীনভাবে নিজেকে সমর্পণ করে শিকদারের হাতে।

> "তোমারেই এই নিদান কালের পুরুষ বলিয়া গণ্য করিয়া তোমার কাছে আইলাম। মনে তো লয় একদিন তুমি আমারে চাইছিলা। এই লও, এখন আমি তোমার।"[৪০]

জোবেদার এইভাবে ফিরে আসাকে শিকদার প্রথমে মেনে নিতে না পারলেও পরে সে নতুন করে জোবেদাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবেগ পরিহার করে জোবেদা বাস্তববাদী হয়ে ওঠে। ফিরে যায় স্বামীর সংসারে।

উপন্যাস দুই বন্ধুর প্রেম নিঃস্ব জীবনের কাছে শাশ্বত হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিক জীবনকে দেখেছেন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে। বিষয় তাৎপর্যকে জীবন লগ্ন হতে সাহায্য করেছে লেখকের রোমান্টিক চেতনার বাস্তব রূপায়ণ। "পূর্ব বাংলার মানুষকে গত পাঁচ'শ বছর ধরে যে ধরনের আনন্দ বেদনাময় কাহিনী হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে, তাকে নবরূপে এনেছেন লেখক। লোকগীতির আবেদনটি এখানে রক্ষিত। দক্ষিণ বাংলার কাশবনের দেশের মানুষ আর প্রকৃতির প্রতি লেখকের নিশ্ছিদ্র আনুগত্য, উপন্যাসের প্রতি পর্বের সূচনার উপলব্ধি লোকগীতি- এসব কিছুই লোকজীবনের প্রতি লেখকের রোমান্টিক আনুগত্যের পরিচায়ক। লোক-কবি শিকদারের হাতের দোতরা আর কণ্ঠে 'সোনার বরনী কন্যা আইলো আমার ঘরে, গান বেজে উঠেছে নদীর কলতানের সঙ্গে।"[৪১] উপন্যাসে মানুষের সব দুঃখ-কষ্ট যেন নদীর স্রোতের টানে ভেসে যায়।

পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরাও যে নারীদের দ্বারা কতটা নিগৃহীত হয় তার প্রমাণ দিয়েছে জোবেদার শ্বাশুড়ী। এখনও সমাজ বাস্তবতায় আমাদের দেশে শ্বাশুড়ীদের নির্যাতনের অনেক দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে জোবেদা যতটা আবেগমুখর তার চেয়ে বেশী বাস্তববাদী হিসেবে উপন্যাসের শেষে উপস্থিত হয়েছে। নারীচরিত্রগুলোর মধ্যে সেই ব্যতিক্রমী। শিকদারও জীবনের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে শেষটায় আপন সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে, আশাভঙ্গের কারণে ব্যথিত হয়ে সংসারের প্রতি তার ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। জোবেদার স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তনের কথা শুনে দৃঢ়তার সাথে সে নৌকায় উঠে বসে। এ যেন তার লোকালয় থেকে পলায়ন, স্বেচ্ছা নির্বাসনের প্রতিরূপ। সার্বিক বিবেচনায় আমাদের বাস্তব জীবন ঘনিষ্ট উপন্যাস হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

কাশবনের কন্যার সফল রূপায়ণ আমাদেরকে গল্পের কাহিনীর মধ্য দিয়ে জনজীবনের প্রকৃত জীবন বাস্তবতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় শিল্পীত মাধুর্যে।

পদচিহ্ন (১৩৭৫)

পদচিহ্ন উপন্যাসের বিষয়-ভাবনা নানা কারণে স্বতন্ত্র। মার্কসীয় সমাজভাবনার সাথে রাজনীতি, ইতিহাস ও পুরাণের বিচিত্র উপাদানের সমন্বয়ে উপন্যাসের কাহিনী অত্যন্ত দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন সত্যেন সেন। বিভাগোত্তর কালের পূর্ববাংলার গ্রামীণ সমাজবাস্তবতার অঙ্গীকারে এই উপন্যাসটির বিশিষ্ট ভূমিকা অনস্বীকার্য। সত্যেন সেনের নির্মোহ ও সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে হিন্দু মুসলিমের মানসিক ও সামাজিক সংকট এ উপন্যাসে যথার্থরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শহরবাসী শিক্ষিত তরুণ আনিস। সুবিনয় তার বন্ধু। আনিস গ্রামীণ জীবন বিশেষ করে হিন্দু পরিবারের জীবনাচরণ অন্তরঙ্গভাবে প্রত্যক্ষ করার মানসে বন্ধুর রক্ষণশীল পরিবারের কথা জেনেও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সুবিনয়ের সাথে শ্রীপুর গ্রামে বেড়াতে আসে। তৎকালীন সমাজ বাস্তবতায় এটা একেবারেই ব্যতিক্রমী ঘটনা। একজন মুসলিম অতিথির আগমন সুবিনয়দের পরিবারের কেউই প্রাথমিকভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু স্বাভাবিক ঔদার্যে সংস্কারকে জয় করে সুবিনয়ের বাবা যামিনী মিত্র ও মা প্রমীলা আন্তরিকভাবে আনিসকে সমাদর করে। পারিবারিক রক্ষণশীলতার কারণে সুবিনয় ঠাকুরমাকে আনিসের আসল নাম না বলে অনিল মিত্র নামে বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দেয়। সাময়িক ভাবে এই সমস্যার সমাধান হলেও উপন্যাসের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ একটি বৃহত্তর সামাজিক রূপ নিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

শ্রীপুর গ্রামে এক সময়ের অভিজাত পরিবার 'দারোগা বাড়ী' বিভাগোত্তর কালের রাজনৈতিক ও সামাজিক জটিলতায় কোন প্রকারে টিকে আছে। "যামিনী মিত্র সেই বিপন্ন অস্তিত্বের দীর্ঘশ্বাস। ... আনিসের পর্যবেক্ষণ এবং সুবিনয়ের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে শ্রীপুর গ্রামের অতীত ও বর্তমান জীবন্ত হয়ে উঠেছে।"[৪২] দেশবিভাগের পর বর্ধিষ্ণু হিন্দু পরিবারের একটা বড় অংশ ভারতের উদ্দেশ্যে পূর্ববাংলা ত্যাগ করে। গ্রামে বর্তমানে আট দশ ঘর হিন্দু ও বাদবাকী সব মুসলমানের বাস। তাদের ঘর-বাড়ি-সম্পদের নতুন অংশীদার ও জীবন-যাপনের ধরণ লেখকের ভাষায় এভাবে ধরা পড়ে-

Dhaka University Institutional Repository

"সবার আগে পরিত্যক্ত দালানগুলিতে তারা এক একটা করে পরিবার বসিয়ে দিয়েছে। দু'এক ঘরে হিন্দু আর সবাই মুসলমান। এই দালানের শ্রীরক্ষা করে চলবার মত সামর্থ্য তাদের নেই। না আছে আর্থিক সঙ্গতি, না আছে শিক্ষা ও রুচি। সুন্দর একটা দোতালা দালানের রেলিং এর একদিক থেকে আর এক দিক পর্যন্ত লাইন করে সাজিয়ে পাট শুকোতে দেওয়া হয়েছে। ... যিনি এই দালান তুলে ছিলেন তিনি কি কখনো এমন কথা ভাবতে পেরেছিলেন, মনে মনে ভাবল আনিস। দরজা জানালাগুলো খসে খসে পড়ছে। ... মনে হয় এখানে ওখানে ঘাসের উপর যেন পুলটিস মেরে দেওয়া হয়েছে।"[৪৩]

রাজনৈতিক বিভাজনের ফলে পূর্ববাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের বিপন্ন, বিপর্যস্ত সমাজের প্রতিনিধি যামিনী রায়। বনেদি পরিবারে পূর্ব পুরুষের আমল থেকে চলে আসা দুর্গাপূজা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। বার মাসে তের পার্বণে বিশ্বাসী এই পরিবারের অন্যান্য প্রাত্যহিক পূজার পাটও চুকে গেছে সঙ্গত কারণে। খুরশেদ আলম পিতৃভিটা ত্যাগ করে পূর্ববাংলার ঘাসির পুকুরপাড় গ্রামে এসে আশ্রয় নেয় 'রায়ের বাড়ী' বলে পরিচিত বন্ধু বঙ্কিম রায়ের বাড়ীতে। পশ্চিম বঙ্গ থেকে পূর্ববাংলায় আসা খুরশেদ আলমের ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবনের সীমাহীন সংকট ও রক্তক্ষত দীর্ঘশ্বাস উপন্যাসের অন্যবাস্তবতা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শুধু ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু জমিদারের সংকটই নয়, এই উপন্যাসে সাত্তার, কাশেম প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে মুসলমান সমাজের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কথাও উঠে এসেছে। প্রগতিশীল মানসিকতার সাত্তার আধুনিক শিক্ষা ও চিন্তাচেতনায় অগ্রসর এক তরুণ, পক্ষান্তরে কাসেম নেতিবাচক মানসিকতার ও অনুদার সাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। কাশেমের বৃদ্ধ পিতামহ আরবালি হাওলাদার আনিসে কাছে অকপটে স্বীকার করেন তার বর্তমান আর্থিক উন্নতির মূলে জমিদার বাবুদের অবদানের কথা। সে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজের একজন প্রতিনিধি। অতীত প্রিয়তার সাথে সাথে বর্তমানের বিপন্ন সমাজ ব্যবস্থা তাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে।

"আনিসের দিক চোখ তুলে বুড়ো দাদু বললেন, কি দেখতে এলে ভাই ? হিন্দুর শ্মশান আর মুসলমানের গোরস্তান, এ যেন হয়েছে তাই।"[৪৪]

আনিস, সুবিনয়, সাত্তার এরা কেউ হিন্দু বা মুসলিম সমাজের প্রতিধিনি নয়, সবাই বাঙালি। চিন্তা চেতানায় মননে তারা গভীরভাবে ধারণ করে মানবধর্মের চেতনাকে। তিনদিনের জন্য আনিস গ্রামে এসে সুবিনয় ও সাত্তারকে সঙ্গে করে যা দেখেছে, যা জেনেছে সেই অভিজ্ঞতাই *পদচিহ্ন* উপন্যাসের বিষয়বস্তু। আনিস এই ক'দিনে সুবিনয়ের বোন আরতির মনকেও জয় করে নেয়। আনিসের প্রতি দুর্বলতা সাম্প্রদায়িক

Dhaka University Institutional Repository

বিভেদের কারণে আরতিকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। আরতির হৃদয়ে সৃষ্টি হয় গভীর শূন্যতার। পাশাপাশি আনিস পেয়েছে এখানকার সংখ্যালঘু মানুষের মনের পরিচয়, জেনেছে ঘাসির পুকুরপাড়ের মুসলমানদের বর্তমান জীবনপ্রবাহ এবং উপলব্ধি করেছে সহানুভূতির সাথে আলম সাহেবকে।*পদচিহ্ন* উপন্যাসের মাধ্যমে সত্যেন সেন আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের ভিতর দিয়েও নবচেতনায় জীবনের প্রগতিশীলতাকে অণিবার্য করে তুলেছেন। বিভাগোত্তর কালের জনজীবনের সত্যিকারের রূপায়ণ সফলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সত্যেন সেনের *পদচিহ্ন* উপন্যাসে।

আদিগন্ত (১৯৫৬)

সরদার জয়েনউদ্‌দীন বাংলা উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণের এক কুশলী শিল্পী। সাবলীল গদ্যের উপস্থাপনায় মানুষের যাপিত জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনায় অসাধারণ সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন । তাঁর লেখাতে জীবন অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। *আদিগন্ত* মূলত গ্রাম বাংলার পটভূমিতে রচিত পদ্মাতীরবর্তী মানুষের জীবন সন্ধানী উপন্যাস। উপন্যাসে নবীনগর নামক একটি গ্রামের জনজীবনের সার্বিক জীবনপ্রবাহকে তুলে ধরা হয়েছে। নবীনগর গ্রামের মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সদা সংগ্রাম করে নিজেদের অস্তিত্ব কোন রকম টিকিয়ে রেখেছে। যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতা মানুষের জীবনে গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এক বৈষ্ণব দম্পতি তাদের তীর্থযাত্রা শেষে গ্রামে ফেরার পথে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয় এবং ছোট্ট একটি মেয়েকে কুড়িয়ে পায়। নিঃসন্তান এই দম্পতি সস্নেহে মেয়েটিকে তাদের সঙ্গে গ্রামে নিয়ে আসে এবং পিতৃ-মাতৃস্নেহে বড় করে তোলে । মেয়ের নাম রাখে সরলা । এই সরলাকে কেন্দ্র করেই মূলত উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। গ্রামের সামাদ মাস্টারের কাছে পড়তে গিয়ে সে জোনাব মন্ডলের ছেলে মেহেরের প্রেমে পড়ে। কিন্তু সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে তারা দুজনই সচেতন। অন্যদিকে কিশোরী সরলার রূপে পাগল হয়ে গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পীর খোরশেদ সরলাকে পাশবিক অত্যাচারে উদ্যত হয়। সরলা কোন মতে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

> "পীর সাহেব সরলার হাত ধরিয়া বুকে টানিয়া লইতে উদ্যত হইলেন । সরলা জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া পীর সাহেবকে ধাক্কা দিয়া হটাইয়া দিল । তারপর সাপের মত ফোঁস ফোঁস করিয়া বলিতে লাগিল, অদৃষ্টে যা হয় হবে, আপনাকে বার বার সাবধান করে দিচ্ছি, আপনি আমার গায়ে হাত দেবেন না, ভাল হবে না।"[৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

সরলা পীরের লালসাকে দৃঢ়তার সাথে প্রতিহত করে ফিরে আসতে সক্ষম হলেও পীরের আক্রোশ এতে বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। মেহের এই অপকর্মের প্রতিবাদ করলে পীর তাকে মিথ্যা মামলায় দারোগার সাথে চক্রান্ত করে খুনের আসামী হিসেবে জেলে দেয়। সরলাকে থানার হাজতে আরেকবার দারোগা লস্কর আলী তালুকদারের লোভের শিকার হতে হয়। সরলা এ অবস্থায় তার দাঁত ও নখ দিয়ে দারোগাকে রক্তাক্ত করে এই নির্মমতার জবাব দেয়। অন্যদিকে মিথ্যা মামলায় মেহেরের দশ বছরের জেল হয় এবং সাক্ষীর কাঠগড়ায় নরোত্তমের মৃত্যু হয়। কিছু দিন পর চেয়ারম্যান পীর সাহেবের রক্ষিতা শরিফা কৌশলে সরলাকে ডেকে আনে। সরলা চক্রান্ত বুঝতে পেরে তীব্র ঘৃণার সাথে পীরকে উদ্দেশ্য করে দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করে

> "আপনাদের মত লোককে দেখে ঘৃণার চেয়ে কৃপা বেশি হয় । দুই দুইটি সংসার আপনি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছেন । ...তবুও আপনার লালসার নিবৃত্তি হলো না । আমার মা মৃত্যুশয্যায় আর আপনি আমাকে চৌকিদার দিয়ে পাকড়াও করে আনলেন । ধন্যি আপনার প্রবৃত্তি । এমনি করে কত মেয়ের সর্বনাশ আপনি করেছেন তার ইয়ত্তা নাই ।আর সবার মত যন্ত্রণা দিয়ে পুড়িয়ে জ্বালিয়ে আমাকে ও হাত করতে পারবেন ভেবেছেন?সেরূপ ভেবে থাকলে আপনার ভুল হয়েছে।"[৪৬]

সরলার এই প্রতিবাদী সংলাপের মধ্য দিয়ে তার নারীসত্তার সচেতন প্রকাশ ঘটেছে। পরিস্থিতির চাপে শরিফা তার ভুল বুঝতে পারে এবং তার মানসিকতায় পরিবর্তন আসে। শরিফা সরলাকে নারী-লোভীদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাতের অন্ধকারে শহরে পালিয়ে আশ্রয় নেয় আইনজীবী বাদশাহ মিয়ার কাছে। সেখানে সরলা সমস্ত কথা বাদশা মিয়াকে জানায়। বাদশা মিয়া দাঙ্গায় হারিয়ে যাওয়া তার নিজের মেয়ের ছায়া যেন দেখতে পায় সরলার মধ্যে। সে পিতৃস্নেহে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন জানায় তদন্তের। কিছু দিনের মধ্যেই নিরপেক্ষ তদন্তে ও শরিফার দোষ স্বীকারের মাধ্যমে চেয়ারম্যান পীর সাহেব ও দারোগা লস্কর আলী দোষী সাব্যস্ত হয়। বিচারে মেহের মুক্তি পায় । উপন্যাসটি এভাবেই সমাপ্তি ঘটেছে।

উপন্যাসে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের চরিত্র উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে লেখক বিপর্যস্ত গ্রামীণ সমাজের সভ্যতার মুখোশ পরিহিত কীটদের চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। মানুষের কল্যাণে নিযুক্ত কর্তাব্যক্তিরা কিভাবে মানুষের জীবনে অকল্যাণ বয়ে আনছে তারও স্পষ্ট বর্ণনা আছে। অত্যাচার, নিপীড়ন, ভণ্ডামি, লালসা যেমন সমাজে ক্রিয়াশীল তেমনি তার প্রতিবাদে শুভ শক্তির জয়ও ঔপন্যাসিক চিহ্নিত করেছেন। উপন্যাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রসঙ্গ থাকলেও লেখক তার পরিণতি উদার মানসিকতা দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের অন্যসব প্রসঙ্গকে আড়াল করে মূলত নারীলোভী দুই পিশাচের কাহিনীই প্রাধান্য পেয়েছে। সে তুলনায় প্রতিবাদী চরিত্র চিত্রণে লেখকের দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেছে।

বাদশা মিয়া ও ছামাদ পণ্ডিত মানবতায়, সততায় উজ্জ্বল থাকলেও সেভাবে পাঠকের চিত্তকে জাগ্রত করে না। তবে চিরকালীন মাতৃত্বের পবিত্র আকাঙ্ক্ষায় সারদা ও গহরের স্ত্রী আসেকজান পাঠককে মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। ছামাদ পণ্ডিত কিংবা বাদশা মিয়ার উচ্চারণে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা সত্ত্বেও উপন্যাসের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য নেই যা পাঠককে উজ্জীবিত করবে। লেখকের বলিষ্ঠ জীবনবোধের ও স্বতন্ত্র সমাজদৃষ্টির কারণে *আদিগন্ত* সমকালীন সমাজের দর্পণ রূপেই চিহ্নিত উপন্যাসের স্বীকৃতি পাবে।

চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪)

যে তিনটি উপন্যাস লিখে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলা কথাসাহিত্যকে ইউরোপীয় আধুনিকতায় সমৃদ্ধ করেছিলেন তার একটি *চাঁদের অমাবস্যা* । *লালসালু* প্রকাশিত হবার চৌদ্দবছর পর প্রকাশিত হয় এই উপন্যাসটি। "কাহিনী গ্রন্থন, বিষয়বস্তু নির্বাচন, উপন্যাসের অভ্যন্তর পরিচর্যা ও অন্তর্বয়ন- সবদিক থেকেই *চাঁদের অমাবস্যা, লালসালু* থেকে প্রাগ্রসর ও সৈয়দ ওয়ালীল্লাহ্র পরীক্ষাপ্রিয়তা ও তাঁর ক্রমসাফল্যের পরিচয়ে উজ্জ্বল।"[৪৭] এই উপন্যাসটিতে 'চেতনা প্রবাহ রীতি' চমৎকার রূপ বিন্যাস পেয়েছে।

এই উপন্যাসটির নায়ক যুবক শিক্ষক আরেফ আলী একদা অন্ধকারে এক যুবতীর মৃতদেহ দেখতে পায়। তারপর থেকে সে হত্যাকারীর পরিচয় উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট থাকে এবং যখন হত্যাকারীর আসল পরিচয় জানতে পারে তখন সে কঠিন আত্ম-পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। মৃতদেহ দেখার পর থেকে হত্যাকারীকে সনাক্ত করার মধ্যবর্তী সময়ে আরেফ আলীর আত্মদহন ও আত্মবিশ্লেষণের বিভিন্ন দিককে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এমন শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, উপন্যাসটির শিল্প সাফল্যে এক নবতর মাত্রা যুক্ত হয়েছে। দরিদ্র শিক্ষক আরেফ আলী অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কারণে স্কুলের সামান্য বেতনে চাকরি নিয়ে গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন বাড়িতে (যা বড় বাড়ি নামে পরিচিত) আশ্রয় গ্রহণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

"দরিদ্র সংসার হাতের তালুর মত এক টুকরো জমিতে জীবন ধারণ চলেনা। টেনে হিচড়ে আই. এ পাশ করে সে দেশে ফিরে আসে। পড়তে পারলে আরো পাশ করতো কিন্তু কলেজের ফি, বইখাতা কেনার পয়সা আর যোগাড় হয় না। তাছাড়া জেলা শহরে খুপসি আস্তানায় থাকলেও খরচ হয় । এক রত্তি শাক-বজির জমিটাও বিক্রি করে উচ্চশিক্ষার পাচাতে ছোটার অর্থ হয় না।"[৪৮]

উপন্যাসটিতে গ্রামীণ জীবনের অস্তিত্ব বিষয়ক বাস্তবতাকে যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর মাধ্যমে লেখক তুলে ধরেছেন। আরেফ আলী যখন বাঁশঝাড়ের আলো-আঁধারী পরিবেশে অর্ধনগ্ন যুবতীর মৃতদেহ দেখতে পায়, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই ভীত হয়ে পড়ে।

"যুবক শিক্ষক জ্যান্ত মুরগি-মুখে হাল্কা তামাটে রঙের শেয়াল দেখেছে, বুনো বেড়ালের রক্তাক্ত মুখ দেখেছে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট মহামারী-হাহাকার দেখেছে, কিন্তু কখনো বিজন রাতে বাঁশঝাড়ের মধ্যে যুবতী নারীর মৃতদেহ দেখে নাই। হত্যাকারী দেখে নাই।"[৪৯]

এই পর্যায়ে সে যে বাড়িতে আশ্রিত, সেই বাড়ির দাদা সাহেবের ছোটভাই কাদেরকে অল্প সময়ের জন্য বাঁশঝাড়ের আলো-আঁধারীতে দেখে ফেলে। মূল গল্পের প্রকৃত শৈল্পিক নবমাত্রার শুরু এখান থেকেই। যখনই কাদেরকে তার নিষ্ঠুর হত্যাকারী বলে মনে হয় তখন থেকেই সে এই সত্য প্রকাশের দায়ভার বয়ে বেড়ায় এবং যেকোন কিছুর বিনিময়ে তার প্রকৃত শাস্তি বিধানে সচেষ্ট হয়। "আরেফ আলী উপলব্ধি করে যদি যুবতী নারীর হত্যাকারী কাদেরের নাম সে প্রকাশ করে, তাহলে আশ্রয় এবং চাকরি উভয় থেকেই সে হবে বঞ্চিত ; এবং প্রমাণের অভাবে আইন ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ষড়যন্ত্র তাকেই হত্যাকারী প্রতিপন্ন করবে। এই পরিণাম আশঙ্কাই তাকে করে তোলে 'মেরুদণ্ডহীন কীটপতঙ্গ' সদৃশ। আরেফ আলীর জটিল অন্তর্যাত্রাকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যে উন্মোচন করেছেন।"[৫০]

"এমন অন্ধকার জীবনে কখনো সে দেখে নাই, অন্ধকার থেকে মুক্তিলাভের জন্য এমন তীব্র ব্যাকুলতাও কখনো বোধ করে নাই। কথাটা প্রকাশ না করে তার উপায় নাই। উপায় থাকলে সে বলতো না। বাঁশঝাড়ে একটি নারী অর্থহীনভাবে জীবন দিয়েছে। তার বিশ্বাস মানুষের জীবন এত মূল্যহীন নয়।"[৫১]

এই মূল্যবোধ তাড়িত হয়ে সে সর্বসম্মুখে যুবতী নারীর হত্যাকাণ্ডের কথা প্রকাশ করলো। কঠিন আত্মপরীক্ষার ভেতর দিয়ে যে অতীত সে যাপন করেছিল তা থেকে যেন সে মুক্তি পেল। "কাদের হত্যাকারী এই সত্য প্রকাশ করলে চাকুরিচ্যুতির, বড়বাড়ির আশ্রয় হারানো, প্রমাণের অভাবে হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত হবার আশঙ্কা প্রভৃতি তার অন্তর্জগৎকে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত করে। কিন্তু একটি প্রাণের এই অপমৃত্যু তার

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচনায় মনুষ্যত্ব ও সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে এক মর্মান্তিক ঘটনা। পরিণামে পুলিশের কাছে সে যুবতী নারীর মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ডের কাহিনী বিবৃত করে। পুলিশের বুটের শব্দে সন্ত্রস্ত আদালতে আরেফ আলীর ভবিষ্যৎ অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু 'সমগ্র মানব-অভিযাত্রার দায়িত্ব, স্বাধীনতা ও সংকল্পের গুরুভার' বহন করে সে শুদ্ধ অস্তিত্বে উত্তীর্ণ হয়।"[৫২]

যে কোন সংকটকালীন জটিলতা থেকেই দেখা যায় মানুষ শিক্ষা নেয় এবং নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। শত প্রতিকূলতার মাঝেও সে তার অস্তিত্বকে বিকশিত করতে চায়। *চাঁদের অমাবস্যা* তে আমরা দেখি তাই শিক্ষক আরেফ আলীর অস্তিত্ব সচেতনতা তাকে কী ভাবে সত্য প্রকাশে অনুপ্রাণিত করেছিল। অনেকদিন ধরে যে কথা সে দাদা সাহেবকে বলতে পারেনি, সেই নির্মম সত্য প্রকাশ করেছে এভাবে

"কাদের মিঞা একটি মেয়েলোককে খুন করেছে।"[৫৩]

কথাটি বলার সাথে সাথে যুবক শিক্ষক নিজেকে অনেক হালকা অনুভব করেছে। আর মাত্র একটা দায়িত্ব যেন তার বাকি। সদর থানায় গিয়ে রিপোর্ট করা। সেই উদ্দেশ্যেই সে তার বাক্স গুছিয়ে শহর অভিমুখে রওনা হয়। পেছনে পড়ে থাকে তার নিশ্চিত জীবনের অতীত।

এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের স্বরূপ যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তবে কোন চরিত্রই আমাদের কাছে অবাস্তব মনে হয় না। ঔপন্যাসিকের মেধাবী চিন্তা ধারার প্রতিটি চরিত্রই তাই যেন হয়ে উঠেছে সমাজ বাস্তবতার নিরিখে জীবন্ত। "দেশকাল সংলগ্ন মধ্যবর্তী ও পরিপ্রেক্ষিত চরিত্র বিশেষত, কাদের-দাদাসাহেব ও তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ, স্কুলের শিক্ষকমন্ডলী প্রভৃতির মাধ্যমে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ গ্রামীণ সমাজ-কাঠামো নির্মাণ করেছেন। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণী ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের সমাজ-অবস্থান ও জীবনার্থ, গ্রামীণ শিক্ষা-ব্যবস্থা, আর্থিক কারণে সৃষ্ট গ্রামের সাধারণ মানুষের অসহায়ত্বের পরিচয়ই *চাঁদের অমাবস্যা*-র বহির্বাস্তবতাকে করে তুলেছে জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য।"[৫৪]

নিজস্ব ধর্মবোধ লালিত দাদা সাহেব আলফাজ উদ্দিন চৌধুরী 'বড়বাড়ির মুরব্বী'। সরকারী চাকুরী থেকে সদ্য অবসর নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করেছেন। দাদাসাহেবের ধর্মীয় আনুগত্য উপন্যাসের একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণ করেছে। ছোট ভাই কাদেরের সাথে তার বয়সের ব্যবধান প্রায় ত্রিশ বছর। কাদেরকে তিনি দরবেশ প্রকৃতির মানুষ মনে করেন। কারণ "তাঁর এরূপ বিশ্বাসের মূলে আছে কাদেরের নৈশ

Dhaka University Institutional Repository

বিহার, এক 'রাতে দরজার খিল খুলে' বহির্গত হয়ে 'পরদিন সকালে' রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে তার গৃহপ্রত্যাবর্তন। কিন্তু বাস্তবে কাদের দরবেশ নয়, ইন্দ্রিয়-শাসিত, ব্যক্তিগত ভোগবাদ-পরিচালিত, মাঝির বউয়ের হত্যাকারী। অন্যকে খুন করে সে থাকে নিরুত্তাপ, আত্মকৃত অপরাধের জন্য তার কোন অনুশোচনা নেই। সে সর্বাবস্থায় অনুতাপশূন্য, সবকিছু ভোগ করেও নির্বিকার, মমতাহীন ও নিষ্ঠুর।"[৫৫]

ছোটবেলা থেকেই কাদের অদম্য খেয়ালি, উগ্র মেজাজ ও দুরন্ত প্রকৃতির ছিল। স্কুলে গিয়েও সে নিয়মনীতির তোয়াক্কা করেনি। অকর্মণ্য, অসামাজিক কাদের বিয়ে করেও স্ত্রীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে পারেনি। ' বড়বাড়ির' অন্যান্য সদস্যের মধ্যে আনোয়ারা ও তার পুত্র ফজলুর কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। দাদাসাহেবের বিধবা কন্যা আনোয়ারা ছেলে ফজলুকে নিয়ে পিতৃগৃহে আশ্রিতা থাকে। এই জীবন বাস্তবতা আনোয়ারাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে।

উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর প্রতি স্কুলের অন্য শিক্ষকদের ঈর্ষা। কারণ আরেফ আলীই একমাত্র বড়বাড়িতে আশ্রিত থাকে, তার থাকা খাওয়ার চিন্তা নেই। মাঝির বউয়ের মৃত্যু নিয়েও শিক্ষকদের মাঝে চলতে থাকে রঙ্গ-রসাত্মক আলোচনা। শিক্ষকরা 'ব্যক্তিগত মতামতের ঢোল বাজাতে' কতটা সক্রিয় তাও লেখক তুলে ধরেছেন সমাজ-নিরীক্ষণের নিপুণতায়।

> "মেয়ে লোকটি আমাদেরই গ্রামের মানুষ।"
>
> না, বিবস্ত্র হয়েও, দেহ বিপুলাকার এবং মুখমণ্ডল কদাকার করেও যুবতী নারী তার পরিচয় ঢাকতে পারে নাই। সনাক্তকারের দৃষ্টির সামনে কোন ছদ্মবেশই নিখুঁত নয়।
>
> "মাঝির বউ"! ...
>
> গ্রামের করিম মাঝির বউ। স্বামীর নাম কি ? ...
>
> নাম যা-ই হোক, সে লম্বা পাড়িতে ঘরছাড়া। ঘরে বিধবা মা, চোখে কম দেখে, বাতের ব্যথায় সব সময়ে গোঙায়। ... "নদীতে পড়লো কি করে"? ...
>
> "এর মধ্যে নিশ্চয় কোন কথা আছে। বলে দিলাম, মেয়ে লোকটির ক্ষেতখামারে যাবার অভ্যাস ছিল।"
>
> নিশ্চয়ই কথা আছে। এমনি পানিতে ডুবে কেউ মরে না।"
>
> বললেন না বাজা মেয়ে লোক? সে-ই হচ্ছে আসল কথা। বিয়ে-থার পর মেয়েমানুষের ছেলেপুলে না হলে পুরুষ-মরদের জন্য মন খামখাম করে। জানা কথা।"
>
> না, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন কথা আছে।"[৫৬]

মূলত *চাঁদের অমাবস্যা*-য় রূপায়িত চরিত্রগুলি তাদের জীবনাচরণকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। যুবক শিক্ষক আরেফ আলী, কাদের, দাদাসাহেব, আনোয়ারা, ফজলু, মাঝির বউ ও তার মা, বোন-সবাই

Dhaka University Institutional Repository

এক একটি সমাজসত্তা, আর্থ-সামাজিক পরিবেশেরই সৃষ্টি আর এই বিশেষ সমাজচৈতন্যই উপন্যাসের মূল কাঠামোর অনিবার্য বাস্তবতার পরিচয়বাহী। বিশেষ করে, আমাদের সমাজজীবনে আরেফ আলী চরিত্রটি বিবেকবান মানুষের প্রতীক। তা না হলে জ্যোৎস্নালোকিত রাতে বাঁশঝাড়ের মধ্যে মৃত যুবতী এবং পাশে দণ্ডায়মান কাদের মিয়াকে দেখে, সে কথাটি কাউকে বলবে কি বলবে না, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে অনেক সময় কাটিয়ে দেয়। অস্তিত্বহীনতার দোলায় দুলতে থাকে সে। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত সে ঘুরে দাঁড়ায়, সাহসী হয়ে ওঠে এবং সিদ্ধান্ত নেয় সব সত্য প্রকাশের। আরেফ আলী হয়ে ওঠে অস্তিত্ববান। ঘটনা বিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ, অস্তিত্ববাদ ও চেতনাপ্রবাহ রীতি প্রয়োগে *চাঁদের অমাবস্যা* একটি অন্যতম শিল্পসম্মত সফল উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করেছে। কাহিনী হয়ে উঠেছে সমাজজীবনের দর্পণ স্বরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

নগর কাহিনী-প্রধান উপন্যাস

সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ উপন্যাসের মধ্যে শুধু গ্রামীণ উপন্যাসই সফল ছিল না, এই সফলতা স্পর্শ করেছিল নগরকেন্দ্রিক উপন্যাসকেও। এ পর্যায়ে ঔপন্যাসিকগণ বিচিত্র দিক থেকে মানুষের জীবনের জটিলতা, দ্বন্দ্বময়তাকে তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। কাহিনী কাঠামোর মধ্যে দিয়ে শহরের মানুষের সামাজিক পরিচয়, ঘটনার বাস্তবতা, ব্যক্তির বিচিত্র প্রবণতা নগরকেন্দ্রিক উপন্যাসের প্রেক্ষাপট নির্মাণে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেশ বিভাগের (১৯৪৭) পরে ঢাকাকে কেন্দ্র করে এখানকার নাগরিকদের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার বিকাশ ঘটে। কলকাতা থেকে ঢাকায় আসা মানুষের অনেকেই কলকাতাকে ভুলে যেতে পারেননি, তাই তাঁদের উপন্যাসে কলকাতার নাগরিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সদ্য স্বাধীন পূর্ববাংলার নগরকেন্দ্রিক চিন্তাধারা। নগরের জীবনযাত্রা বিভাগ-পরবর্তী কালে ক্রমশ জটিল হয়ে উঠে ; মানুষের উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষার ভেতর মানবতা যেন অসহায়। বাংলাদেশের উপন্যাসে তাই নগর জীবনের বিভিন্ন চিত্রের সফল উপস্থাপনা দেখা যায়।

জীবন পথের যাত্রী (১৯৪৮)

জীবন পথের যাত্রী উপন্যাসে আবুল ফজল শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম সমাজের 'অন্দর মহলের' জীবনালেখ্য তুলে ধরেছেন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। *জীবন পথের যাত্রী* মূলত একটি প্রেম কাহিনী। শহরের নাম করা ব্যারিষ্টার আজমল বিপত্নীক। দু'টি সন্তান নিয়েই তার স্বপ্ন। কন্যা হেনা ও পুত্র মহসিনের পড়ালেখা পড়ার সুবিধার্থে শিল্পমনস্ক মামুনকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। কিশোরী হেনা মামুনকে ভালবেসে ফেলে। চারিত্রিক দৃঢ়তায় মামুন হেনার সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করে তাকে প্রত্যাখান করে। একসময় নিজের গোপন দুর্বলতাকে ঝেড়ে আড়াল করার জন্য কিছুদিন বাইরে থাকার কথা বলে আজমল সাহেবকে এবং নতুন গৃহশিক্ষক হিসেবে হাশিমকে ঠিক করে দেয়। ধীরে ধীরে হাশিমের সঙ্গে হেনার একটা মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এদিকে মামুনকে উপযুক্ত পাত্র হিসেবে বিবেচনা করে আজমল সাহেব মামুনকে প্রস্তাব করে হেনাকে গ্রহণ করার জন্য। মামুন সম্মত হয় ; কিন্তু অতীতে মামুনের উপেক্ষার কথা স্মরণ করে হেনা এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। হেনার ছোট ভাই মহসিন ম্যাট্রিক পাশ করার পর বিলেতে পড়তে চলে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

কিছুদিনের মধ্যে আজমল সাহেব মারা যান। হেনা একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। অগাধ সম্পদের অধিকারিণী হেনার চারদিকে ভিড় করে অনেক স্তাবকের দল। বন্ধনহীন জীবনে হেনার অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে, পুরুষের মুখোশের অন্তরালে সে দেখতে পায় সংযমহীন লোলুপতা, শুধু মামুনকে ব্যতিক্রম মনে হয় তার।

হেনা স্বেচ্ছাচারী জীবনে হাশিমকে স্বেচ্ছায় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার প্রাক্কালে খুব অল্পের জন্য বড় রকমের একটা প্রতারণার হাত থেকে বেঁচে যায়। হাশিমের স্ত্রী ও সন্তানদের উপস্থিতিতে হেনার মোহমুক্তি ঘটে। কিছুদিন পর বিলেত থেকে সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মহসিন ফিরে আসে। মামুন ও তার শিল্পকর্ম সম্পর্কে মহসিনের মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সে কথা আরো স্পষ্ট হয়-

> "... এ'যুগের কোন জীবন্ত মানুষের পক্ষেই সাম্যবাদকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ... প্রতিভাবান লোক চিরকাল তাঁর যুগের পুরোভাগে চলেন ... দেশের আপমর জনসাধারণ ও তাদের জীবন এবার তাঁর তুলি ও লেখনিমুখে রূপ-পরিগ্রহ করেছে। জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন শিল্পের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। মামুন ভাইয়ের মত সজাগ শিল্পীর পক্ষে এই সত্য উপলব্ধি করতে দেরী লাগবার কথা ত নয়।"[৫৭]

কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনীতি দেশে নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে মহসিনকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। মামুন গ্রামে ফিরে যাবে বলে মনস্থির করে এবং যাবার আগে একবার হেনার সাথে দেখা করতে আসে। বাড়ির দারোয়ানের কাছে মহসিনের গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ পায়। দোতলায় গিয়ে কান্নারত হেনাকে দেখে পকেট থেকে রুমাল বের করে হেনার চোখ মুছিয়ে দেয় মামুন। হেনার মাথা বুকের সাথে জড়িয়ে তাকে সান্তনা দেয়। পূর্ব থেকে সমাজতন্ত্রে আকৃষ্ট মামুন হেনার সাথে যোগ দিয়ে মহসিনের অসম্পন্ন কাজ সাগ্রহে তুলে নেয় নিজ দায়িত্বে।

উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনী থেকে বোঝা যায় যে আবুল ফজল নায়িকা প্রধান এই উপন্যাসে প্রেমের পরিবর্তে আদর্শকেই সবার উচ্চে স্থান দিয়েছেন। "তিরিশ-চল্লিশের দশকের বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজে নারী-অস্তিত্বের স্বরূপ হেনা চরিত্রের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি যেমন হেনাকে সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা সচেতন, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধে জাগ্রত এবং নারীত্বের প্রশ্নে জিজ্ঞাসা কাতর করেছে, তেমনি মাতৃহীন নিঃসঙ্গ জীবনে পিতা আজমল হোসেনের চরিত্রের প্রভাব তাকে করেছে আত্মকেন্দ্রিক, উগ্র ও বাস্তব জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। হেনা চরিত্রের রূপান্তরকেও সরলরেখায় বিন্যস্ত

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন আবুল ফজল।"[৫৮] তৎকালীন সমাজব্যবস্থার বাস্তবতায় একটি মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের সত্যিকারের সমাজচিত্র আবুল ফজল উদার দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে চিত্রিত করেছেন। "আজমল চরিত্রের একটি অসাধারণতা এইখানে প্রকাশ পেয়েছে যে তিনি ধর্মীয় গণ্ডীর বাইরে বিজ্ঞান জগতের আবহাওয়াতে নিজেকে ও নিজের সন্তানগণকে লালন করেছেন। আর ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন থেকেও তিনি সৎ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। বস্তুত: ধর্ম নিয়ে মাথাব্যথা আছে এমন চরিত্র *জীবন পথের যাত্রী* তে একটিও নেই। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নিয়ে এই উপন্যাসের মধ্যে শিল্পীর জীবনকে দেখার পালা চলেছে যেন।"[৫৯]

হাশিম ও শাহাদৎ এর চরিত্র উপন্যাসের বাস্তবতাকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। হাশিম ছিল কপর্দকহীন রাজনৈতিক কর্মী। বিষয় সম্পত্তির লোভে ঘরে স্ত্রী-সন্তান থাকতেও হেনার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করেছে। এই বাস্তবতা আমাদের বর্তমান সমাজে সমভাবে বিরাজমান। এক্ষেত্রে শাহাদৎ এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উচ্চাভিলাষী ও স্বার্থপর এই যুবকের সান্নিধ্যই হেনাকে পুরুষ সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করেছে। হেনার প্রতিবেশী দরিদ্র রমনী তার অভাবকে অস্বীকার করে হেনার দানকে ফিরিয়ে দিয়েছে যা হেনার আত্মসম্মানে লেগেছে। হেনা দরিদ্র রমনীকে তার ভিটে থেকে উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মামুনের হস্তক্ষেপে হেনা তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। মর্যাদা সচেতন নারী হিসেবে হেনা তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষা-দীক্ষা চেতনাকে প্রগতিশীল জীবনযাত্রা থেকে আড়াল করে রাখতে চায়নি। তাই পিতার মৃত্যুর পর হেনা দেখেছে পুরুষের বিচিত্র স্বভাবের প্রকাশ। এক সময় হেনার মনে হয়েছিল মা হওয়া নেহায়েৎ মধ্যযুগীয় আইডিয়া। কিন্তু আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হেনা জীবনজিজ্ঞাসার নতুন দ্বারপ্রান্তে এসে উপলব্ধি করে বন্ধ্যাত্ব মানবজীবনের কলঙ্ক, সৃষ্টি ছাড়া মানুষের জীবন ব্যর্থ। অবস্থার প্রেক্ষিতে হেনার মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। শোষণহীন সমাজ গড়বার স্বপ্নে মামুনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদের দিকে ঝুঁকেছে সে। হেনার জীবনের এই পরিবর্তন মূলত মামুন ও মহসিনের অন্তরসত্য যা হেনাকে প্রভাবিত করেছে। মামুনের প্রতি প্রতিশোধ-পরায়ণতায় হেনা বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও শেষ পর্যন্ত মামুনকেই জীবন পথে সহযাত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে। তৎকালীন সমাজব্যবস্থার বাস্তবতায় একটি মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের সত্যিকারের সমাজচিত্র আবুল ফজল *জীবন পথের যাত্রী* উপন্যাসে উদার দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে চিত্রিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

রাঙ্গা প্রভাত (১৯৫৭)

দেশ বিভাগ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সামাজিক অবস্থা, পাকিস্তান শাসিত পূর্ববাংলার জনজীবনে সার্বিক বাস্তবতা, সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে নতুন জিজ্ঞাসায় আবুল ফজলের *রাঙ্গা প্রভাত* পূর্ববাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উন্নত মানসিকতার পরিচয়বাহী উপন্যাস। কাহিনী বিস্তারে তৎকালীন সমাজবাস্তবতাকে রোমান্টিক আবহে উপস্থাপিত করেছেন আবুল ফজল। "দেশপ্রেমের সর্বাঙ্গীন আদর্শ এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের দেশের বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে জাতীয় ঐক্য এবং দেশপ্রেম কি রূপ নেবে সেই চিন্তা সূত্রেই উপন্যাসের জন্ম।"[৬০]

সমকালীন সময়ে জমিদারগণ গ্রামে বাস করলেও শিক্ষা-দীক্ষায় ও চাল-চলনে নগরকে অনুরসণ করতেন। শঙ্খ নদী তীরবর্তী ইচ্ছাখালী গ্রামের জমিদার মির্জা আবুল হোসেন পৌত্র কামালের মুখের দিকে তাকিয়ে বার্মা প্রবাসী দুঃশ্চরিত্র পুত্রের শোক ভুলতে চেষ্টা করেন। মেধাবী কামাল পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষা বাইরের বই পড়ার প্রতিই বেশি আগ্রহী। হোসেন সাহেবের অসুস্থতার খবর শুনে একদিন দু'পুরুষের পারিবারিক বন্ধু চারু বাবু হোসেন সাহেবকে দেখতে আসেন। কামালের সঙ্গে পরিচয় হয় চারুবাবুর কন্যা মায়া ও পুত্র মুকুলের সাথে। অচিরেই এই পরিচয় বন্ধুত্বে রূপ নেয়। হোসেন সাহেবের মৃত্যুর পর কামালের বি.এ পড়ার সময়ই ভারত বিভক্ত হয়। সাম্প্রদায়িক আক্রমণে চারুবাবু মারা যান। চারুবাবুর প্রতি কামালের ভক্তিশ্রদ্ধা বেড়ে যায়। চারুবাবুর সাথে পরিচয়ের সূত্র ধরেই মায়ার প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করে কামাল। মায়াকে ঘিরে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে সে। অথচ উপলব্ধি করতে পারে সাম্প্রদায়িক বিভেদের বেড়াজাল। মায়াকে ভালবাসলেও ঘর বাঁধার স্বপ্ন প্রায় অবাস্তব মনে হয়েছে তার কাছে। মুকুল বোনের চোখের ভাষা বুঝতে পেরে কামালের হাতে বোনকে তুলে দেয়ার প্রস্তাব দেয়। মুকুলের উদার মানসিকতায় বিস্মিত হয় কামাল। নিজের মনকে সংযত রেখে সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করে সে। এরই মাঝে মুকুলরা সপরিবারে কলকাতা চলে যায়। সাম্প্রদায়িকতার আগুনে চারুবাবুর প্রতিষ্ঠিত স্কুল ঘরটি পুড়ে যায়। আগুন নেভাতে গিয়ে কামাল আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। খবর পেয়ে মায়া কলকাতা থেকে ছুটে আসে। কামাল সুস্থ হওয়ার পর মুকুল কামালের হাতে বোনকে তুলে দেয়। উচ্চারণ করে-

> "এ আমার বহুদিনের স্বপ্ন, তোমাদের জীবন দেশের সামনে মিলন আর শান্তির দূত হোক। ধর্মীয়, সামাজিক ব্যবধানের ফলে কি নিদারুণ মূল্যই না আমাদের দিতে হয়েছে, দিতে হচ্ছে, হয়ত ভবিষ্যতে আরো দিতে হবে ...

Dhaka University Institutional Repository

নিঃসীম অন্ধকারে কোন পথ ত দেখতে পাই না। এই অন্ধকারে তোমরা প্রথম আলোর দূত হও। মনে মনে এই আমি চেয়েছিলাম। ... জান ত জলের চেয়ে রক্ত অনেক অনেক বেশি গাঢ়, তাই রক্তের বাঁধ গড়ে তোলার এই দুঃসাহস করেছিলাম।"[৬১]

উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে আবুল ফজল দেশপ্রেমের এক সর্বজনীন আদর্শ মূর্ত করে তুলেছেন। ঔপন্যাসিকের নিজের ভাষ্যমতে "এ বইতে একটি মানুষের স্বর (Human Voice) শোনা গেছে-একজন অনুভূতিশীল সহৃদয় ও দরদী পাকিস্তানীর কণ্ঠস্বর। সর্বত্র বিরাজ করেছে একটা মানবীয় পরিবেশ ; সঙ্কীর্ণতা আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একটা ধিক্কার ধ্বনি যেন সবসময় উত্থিত হচ্ছে। এটি মহৎ বা সফল উপন্যাস নয়, কিন্তু মানবিক পরিবেশের জন্য এটি এযুগের পাকিস্তানি সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের দাবী রাখে, এ যুগে এমন আন্তরিক বইও কম লেখা হয়েছে।"[৬২]

উপন্যাসে চারু বাবু হৃদয়ের সত্যতম উপলব্ধি থেকে দেশপ্রেমে গভীর সত্যনিষ্ঠা প্রকাশ করেছেন। কামাল ও মুকুলের আধুনিক দৃষ্টিকোন থেকে স্বদেশ-প্রেমের আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে । সেই হিসেবে সমাজতন্ত্রের আলোয় *রাঙ্গা প্রভাত* পুরোপুরি আদর্শ ভিত্তিক উপন্যাস। "কামাল ও মায়ার প্রেম ঠিক স্বাভাবিক নরনারীর প্রেম নয়। তারা দু'জন দু'জনকে মনে মনে যতোই ভালবাসুক, নিছক সেই ভালবাসার প্রেরণায় তারা ঘর বাঁধতে ইচ্ছুক নয়, যখন মুকুল তাদের বুঝিয়েছে এবং কামাল নিজেও বুঝেছে যে, বৃহত্তর একটা আদর্শের জন্য তাদের মিলিত হওয়া প্রয়োজন তখনই তারা মিলতে পেরেছে। তাদের মিলনের ব্যাপারে মুকুলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কামাল ও মায়া দু'জনেই দু'পাশে যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে রয়েছে, মাঝখানে মুকুল এসে দু'জনকে দু'দিক থেকে টেনে এনে মিলিয়ে দিয়েছে।"[৬৩] *রাঙ্গা প্রভাত* উপন্যাসটি মানবতা ও দেশপ্রেমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা প্রধান চরিত্রগুলোকে স্পর্শ করতে পারেনি তাদের জীবনবোধের কারণে।

অনেক সূর্যের আশা (১৯৬৭)

সরদার জয়েনউদ্‌দীন ছিলেন বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যের অন্যতম আর্থ-সামাজিক, ভূ-রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও সময় সচেতন কথা সাহিত্যিক। তাঁর *অনেক সূর্যের আশা* উত্তম পুরুষে রচিত

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যক্ষ জীবন বোধের উপকরণ উৎসে সমৃদ্ধ উপন্যাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও মানবিক অপচয়ের প্রেক্ষাপটে মানুষের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের সামাজিক ইতিহাস যেন প্রতিফলিত হয়েছে এই উপন্যাসে। আমরা লক্ষ্য করি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সময়কালে ঘটমান সামগ্রিক পরিস্থিতি লেখক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। উপন্যাসে স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রসঙ্গ, সামাজিক অবক্ষয়, মূল্যবোধের অভাব, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা,দেশ বিভাগ এবং বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার মানুষের জীবনাকাঙ্ক্ষা উদ্ভাসিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কবি রহমতের আত্মবিশ্লেষণমূলক ভূমিকার মধ্য দিয়ে কাহিনী পূর্ণতা পেয়েছে। উপন্যাসের কাহিনী বিস্তৃত হয়েছে অসংখ্য চরিত্রকে অবলম্বন করে। এই উপন্যাসের উপকরণ নির্বাচন এবং বিষয় কল্পনার সামগ্রিক প্রয়োজনে নানাবিধ চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে উপন্যাসে। তাদের মধ্যে রহমত হায়াত খাঁ, হেনার মা, লুসি সাইপ্রিন, ছমির মিয়া, শাজাহান চৌধুরী, কবি নিজাম, কমল কুমার রায়, মিস রডারিক, কাজী গিয়াসুদ্দিন, আব্দুল হামিদ, ফজলুল করিম, পান্ডেজী, মি.গাঙ্গুলী, সুলতান মিয়া, জামরুল প্রভৃতি চরিত্রের আশ্রয়ে উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে। তবে রহমত, হায়াত খাঁ, লুসি সাইপ্রিন, হেনার মা, শাজাহান চৌধুরীর চরিত্র উপন্যাসের ব্যক্তব্যকে সাবলীল করেছে। *অনেক সূর্যের আশা* এক কথায় সমাজ ও রাজনীতির ব্যাপক পরিসরে রচিত উপন্যাস। উপন্যাস শুরু হয়েছে ১৯৫১ সালের দেশ বিভাগোত্তর পূর্ব পাকিস্তানের সমাজ বাস্তবতা বর্ণনার মধ্য দিয়ে। এ দেশের মানুষের নিত্যদিনের সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কলকাতা ছেড়ে পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় পদার্পনের মুহূর্তে কবি রহমতের অনুভূতি ছিল–

> "তখন সুবেহ সাদিকের আলোয় আলোয় পূর্ব আকাশ আলোর বন্যায় নেয়ে উঠছে, ঝলমল করে রেঙে উঠছে দিগন্ত। মনে মনে কেবলই ভাবছি, ঐ ওখানে ঐ আলোর পরে সে দেশ- সে স্বপ্নের দেশ - সে আজাদ দেশ আমার। যেখানে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নাই, নাই অভুক্ত জনমানব। গরিব কাঙাল রাজা জমিদার সব সেখানে সমান, সব একই মানুষ। ...সামনে চেয়ে দেখি, সবুজ সুন্দর আজাদ পতাকা আমাদের অনেক আশা আকাক্ষার প্রতীক শান্তির বিমল চাঁদ বুকে নিয়ে পত পত করে উড়ছে।"[৬৪]

কবি রহমতের এই অনুভব যেন একান্তভাবেই মধ্যবিত্তের দেশপ্রেমের বহি:প্রকাশ। রহমতের সাথে একই মেসে থাকে শ্রমিক দরদী হায়াত খাঁ। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জীবিত হায়াত খাঁ পর্যন্ত দ্বি-জাতিতত্ত্বের ফাঁদে পড়ে যায় নতুন আলোর আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তার সে

Dhaka University Institutional Repository

মোহ ভঙ্গ হয়। হায়াত খাঁ শ্রমিক আন্দোলনে জেলে গেলে করিতকর্মা মানুষ ছমির মিঞা তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। সে বুঝতে পারে অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া একটি জাতির স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই। তাই মেহনতি মানুষের অধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার মানুষটি সত্যের পথে থাকার জন্য কারো সঙ্গে আপস করেনি। পাকিস্তানি রক্ষীদের গুলিতে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে। সে ছিল প্রকৃত দেশপ্রমিক। উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র রহমত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক বিভাগে লোক নেয়া শুরু হলে মেস থেকে পালিয়ে গিয়ে সৈনিকের প্রশিক্ষণ নেয়। জীবন চলার পথে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করা উদ্যমী তরুণ সে। ১৯৪০ সালে যখন দেশ জুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক, তখন সেনাবাহিনীতে সম্পৃক্ততার কারণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে নানারকম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সে। তাই দেখা যায় রহমতের চরিত্রকে ঘিরেই প্রসঙ্গক্রমে উপন্যাসে কলকাতার জনজীবনের প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠেছে। মানুষের দুর্বিষহ জীবন, দুর্ভিক্ষ, হতাশায় সত্যিকার অর্থে সমাজের যে ভয়াবহ অমানবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তা লেখক রহমতের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন ।

> "কলকাতায় বাস করে সিফিলিসের হাত এড়িয়ে চলা এত সহজ কথা নয় এখন। ... সে এখন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে গ্রাম-পোড়ান আগুনের মত । প্রত্যেকটি অলিগলিতে সিফিলিসের জার্ম মেয়েরা দু'হাত বেড় দিয়ে মানুষকে ধরছে আর দেহে সে বীজ ঢুকিয়ে দিচ্ছে"[৬৫]

লক্ষ্ণৌতে প্রশিক্ষণকালে কয়েকজন বাঙালির সাথে তার পরিচয় হয়। প্রশিক্ষণ শেষে গাড়োয়াল জেলার ল্যান্সডাউনে কাজে যোগদান করে সে। এখানে সে নার্সদের উপার্জন বৃদ্ধিতে মূল্যবোধহীন দুঃখজনক কর্মকাণ্ড দেখতে পায়, বুঝতে পারে মানুষের নৈতিকস্খলন যুদ্ধের কারনেই সৃষ্ট। রহমতের সঙ্গে শাজা মিয়ার স্ত্রী মিসেস সাইপ্রিনের পরিচয়ের পর একটা মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এক পর্যায়ে রহমতের কাছে চলে আসে মিসেস প্রিন। কিন্তু বন্ধুর কাছে অকৃতজ্ঞ হওয়ার ভয়ে সে মিসেস সাইপ্রিনকে ফিরিয়ে দেয়। অবস্থার প্রেক্ষিতে একদিন মেসের ঝি হেনার মায়ের কাছে তাকে আশ্রয় দান করে। সেখানে হায়াত খাঁর সান্নিধ্যে সে-ও মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নেয়। মিসেস সাইপ্রিনের কর্মতৎপরতা দেখে হেনার মা চিন্তিত হয়ে ওঠে। কিছুদিনের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হয় মিসেস সাইপ্রিন। ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে পড়ে রহমত। সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারায় রহমতের নিজস্ব ভাবনার প্রকাশ আমরা দেখি

> "আমি যতই শুনছি ততই আশ্চর্য হয়ে ভাবছি, এ কি কাণ্ড। যাদের সঙ্গে এক সাথে রাত দিন চলাফেরা করি, এক মেসে খাই, ভাই ভাই হয়ে গলায় গলায় মিশি, তারা পর্যন্ত একদূর ফাঁক হয়ে গেছে মনে। যেহেতু আমি মুসলমান

Dhaka University Institutional Repository

> জাতের বংশে জন্মেছি, সেহেতুই আমায় ওরা অপরাধী করেছে। মনে হচ্ছে মানুষের মানবতা বলে কিছুই আর নেই। সব মানুষ জাত হিসেবে আলাদা হয়ে গেছে , অবিশ্বাসের ধোয়ায় সবাই আবৃত হয়ে পড়েছে"[৬৬]

রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দ্বারা সৃষ্ঠ সামাজিক পরিবর্তন দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির সাফল্য, সীমাবদ্ধতা, বিপর্যয়, আত্মসম্মানের প্রয়াস ও ব্যর্থতা বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপস্থিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সৃষ্ট যুগ-যন্ত্রণার প্রভাবে আমাদের গ্রামীণ সমাজও বিপর্যস্ত হয়েছিল নানাভাবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কালোবাজারিদের হস্তক্ষেপে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির ফলে জনজীবন শোচনীয় অবস্থার শিকার হয়েছিল। দেশজুড়ে দুর্ভিক্ষ আর অভাব মানুষের মধ্যে নতুন ধরনের পেশার উদ্ভব করেছিল। উপন্যাসে হাফিজনের মায়ের চিঠিতে তার প্রতিভাস পাওয়া যায়।

> "সুলতান মিয়ার ছোট বিবি ক্ষুধার জ্বালায় তেষ্টতে না পেরে হিরু মাতবরের সঙ্গে চাটগাঁ শহরের পথে চলে গেছে। যেখানে গেলে খাবার পাবে। হিরু মাতবর মিলিটারিতে কুলী কামীন সাপ্লাই দেয়, কম বয়স হলে তো কথাই নাই- লুফে বিক্রি হয়।"[৬৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী প্রভাব জনজীবকে বিপন্ন করে তুলেছিল ঠিকই, কিন্তু মানুষ তার মধ্যদিয়েও নতুন ভাবে স্বপ্ন দেখে নিজের আলাদা একটি ভূ-খণ্ডের।

এই উপন্যাসে হিন্দু মুসলমানের রাজনৈতিক বিরোধ শ্রেণী-সংঘাতেই পরিণত হয়েছে। উত্তাল এক রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণ উপন্যাসের উপজীব্য বলেই উপন্যাসে জনজীবনের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট সমানভাবে ফুটে উঠেছে। প্রাসঙ্গিকভাবে *অনেক সূর্যের আশা* উপন্যাস সম্পর্কে আবুল ফজলের মূল্যবান মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে, "যে যুগের পটভূমিতে এ উপন্যাস, সে যুগ ও তার দুঃখ -বেদনা-আনন্দ-আশা- অভীপ্সা সবই আমাদের দেখা ও জানা। তার এমন শিল্পোত্তীর্ন আলেখ্য এর আগে জেনেছি বলে মনে পড়ে না। শিল্প শুধু বাস্তব নয়, বাস্তবেরও বেশি, জীবনের চেয়েও মহানতর এ বোধ ও বোধি আপনার উপন্যাসে এমন ভাবে মিলে একাকার হয়ে যেতে পেরেছে বলেই একে শিল্পোত্তীর্ন বলছি"[৬৮] *অনেক সূর্যের আশা* মূলত মানুষের মুক্তিচেতনায় স্বপ্নময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী উপন্যাস। অনেক সূর্যের আলোর স্বর্ণালী বর্ণচ্ছটার মত।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরণ (১৯৭০)

সত্যেন সেনের *উত্তরণ* উপন্যাসের সামাজিক প্রেক্ষাপট ব্যতিক্রমধর্মী রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ। বিভাগ পূর্ব ও বিভাগোত্তর কালের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসে জীবনবাস্তবতার প্রয়োজনেই ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। মালেকের ব্যক্তিজীবন, অস্তিত্ব সংকট, দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার মানবিক রূপান্তরের বিষয়টিই উপন্যাসে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। কৃষিজীবী থেকে শ্রমজীবী মানুষের প্রোলেতারীয় জীবনের সামগ্রিকতাকে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন জীবনবোধের অভিজ্ঞতা থেকে।

শ্রমজীবী মালেক গ্রামীণ পরিবেশে ম্যাট্রিক পর্যন্ত লেখাপড়া করে মা ও ছোটভাই রফুকে নিয়ে অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করায় আগ্রহী। টালি সুকানি মালেক খালাসী, রং কারখানার কর্মী, কাশীপুর গান ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের সঙ্গে থেকে শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়। সে তার মামা সারেং কদম আলীর সঙ্গে 'নাগর' ফ্ল্যাটে থাকে। বাহান্ন টাকা বেতনের পঁচিশ টাকা গ্রামে মায়ের জন্য পাঠায়। মালেকের পেশকার বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কারণে মালেকের মাকে স্বামীর সংসার ত্যাগ করতে হয় দুই পুত্রকে নিয়ে। কৈশোরে মালেক মায়ের প্রতি বাবার অনেক নির্যাতন প্রত্যক্ষ করেছে। মাত্র ১৯ বছর বয়সে মায়ের দুঃখ লাঘবের জন্য টালি সুকানী হয়েও সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে শোষনের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে মানসিক প্রস্তুতি নেয় এবং সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহনও করে।

> "মাসুদ ভাই, মনে মনে ভয় ছিল, আমি বড় দুর্বল, কি করতে কি করে বসি। কিন্তু আজ আমার সে ভয় কেটে গেছে। ওরা এত করেও আমার মুখ থেকে একটা কথাও বের করতে পারেনি। ওরা হেরে গেছে।"[৬৯]

মালেকের মানস বিকাশে যে মানুষটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছ সে সম্ভবত রহমান। কৃষক পরিবারের সন্তান রহমানের কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা, জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে শ্রমিকে রূপান্তরিত হওয়া, শ্রমজীবী মানুষের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবনকে অভিন্ন করে দেখা সবই মালেকের চরিত্রে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। তার মামা কদম আলী সারেং, খালাসি রহমানকে পছন্দ না করলেও শ্রেণী সংগ্রামের প্রশ্নে মালেক তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। রহমান তার প্রেরণা, যে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও নীতি বিসর্জন দেয় না। যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অনিবার্যতায় কৃষ্ণা কেমিক্যাল ওয়ার্কস এর চাকরি চলে যায় মলেক তখন সারা জীবনে ভাবতে পারেনি যে মুসলমান হওয়ার অপরাধে সে কখনো চাকরি

Dhaka University Institutional Repository

হারাতে পারে। এই বাস্তবতায় আবার পথে ভাসে সে। মালেকের ঘটনাবাহুল জীবনে সাম্প্রদায়িক বিভেদের মধ্যেও কংগ্রেস কর্মী মনোজ আতর্থীর মতো ব্যক্তির সান্নিধ্য মালেককে শ্রেণী সংগ্রামের সৈনিকে রূপান্তরিত করে। বদলে যায় তার জীবনধারা। সত্যেন সেন আপন চেতনার আলোকে এই মালেক চরিত্রটিকে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণী সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত করেছেন।

ইতিমধ্যে মালেক জেনেছে তার মামা কদম আলী মেয়ে জুলেখাকে বিয়ে দিয়েছে এবং নিজেও একটি বিয়ে করেছে। পিতার মৃত্যুতে মালেক তার মায়ের অস্তিত্বের অসহায়ত্বকে উপলব্ধি করেছে। তার মা স্বামীর ভিটায় ফিরে যেতে চাইলে মালেক বুঝতে পারে তার মায়ের অন্তর্জগতে পিতার জন্য কত ভালবাসা ছিল। যে মানুষটি বেঁচে থাকতে প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে তার মাকে অত্যাচারিত করেছে, আজ সেই মানুষটির মৃত্যুতে তার মা-ই যেন বেশি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। পুরুষশাসিত সমাজে স্বামী-পরিত্যক্তা আমিনার স্বামী নামক মানসিক আশ্রয় এক নিগূঢ় অর্থ বহন করে। এই বেদনা তাকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত করেছে। বাড়িতে গিয়ে পিতার কবরের পাশে মায়ের সদ্য মাটি-দেয়া কবর দেখে মালেকের বেদনাময় অনুভূতির প্রকাশ এই উপন্যাসের এক আবেগস্পন্দিত আবহের সৃষ্টি করে। বাড়িতে এসে মালেক আরো দেখে জুলেখার স্বামী সৎ মায়ের বোনকে বিয়ে করেছে। এতে মালেকের কষ্ট আরও দীর্ঘায়িত হয়।

মায়ের মৃত্যুজনিত আঘাত এবং বিভাগোত্তর কালের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক জটিলতায় মালেক কলকাতায় ফিরে না গিয়ে নারায়ণগঞ্জে পাট কোম্পানিতে চাকরির মাধ্যমে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করে। নানা কাজের মধ্যে জুলেখার কথাও তার মনে পড়ে। পাট কোম্পানিতে চাকরির সূত্র ধরে মালিক-শ্রমিক শ্রেণীর সংঘবদ্ধ অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে। সে বুঝতে পারে সুরুজ মিঞা শ্রমিকদের প্রতিনিয়ত ঠকিয়ে চলেছে। প্রতিবাদে সুরুজ মিয়ার ষড়যন্ত্রে রক্তাক্ত হয় সে। তার রূপান্তরিত সত্তার পরিচয় পাই আমরা এভাবে–

> "একটি প্রচন্ড আঘাতের মধ্য দিয়ে বাইরের বাধা ভিতরের বাধা সবকিছু অপসারিত হয়ে গেছে। এত দিনের সংকীর্ণ পরিবেশের বেষ্টনী ভেঙ্গে বিপুল জনতার মাঝখানে এসে পড়েছে। এর মধ্যেই তার মুক্তি। সকল আনন্দের বড় আনন্দ, সে আজ সেই আনন্দের স্বাদ পেয়েছে।... এরই মধ্যে এরই পাশাপাশি আর এক স্বপ্ন পেয়ে বসল তাকে। মৃত্যুর বুকে নবজাতকের মত, অন্ধকারের বুকে আলোকশিখার মত, এই স্বপ্নের মধ্যে এক অনাগত নতুন দিনের আগমনী। রহমান ভাইয়ের চোখে, হারুনদের চোখে এই স্বপ্নের ছায়া দেখে সে মুগ্ধ হয়েছেল।"[৭০]

Dhaka University Institutional Repository

ছোট ভাই রফুর মুদি দোকানে কাজ করা এবং সুতাকলে জুলেখার কাজ পাওয়া সবকিছুই জীবনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রামশীল জীবনচেতনার অংশ। সত্যেন সেন তাঁর রাজনীতি সচেতনতাকে উপন্যাসে রূপায়িত করতে গিয়ে ব্যাপক পটভূমিতে পূর্ববাংলা ও কলকাতার জীবনের নিম্নবিত্ত মানুষের চির সংগ্রামশীল নানা চরিত্রকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে হাজির কারেছেন।

"তিনপর্বে বিভক্ত দীর্ঘায়তন এই উপন্যাসে পনের বছরের সময়সীমায় আমাদের দেশের ক্রান্তি পর্বের আলোড়ন আর বিপর্যয়ের ছবি আঁকা হয়েছে। আদর্শবাদী রাজনৈতিক ভাবনার চড়া সুরে বাঁধা এই উপন্যাস জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ, চাষী, খালাসী সুকানীদরে আলেখ্যচিত্রণে নিবিড় মমতা, নদীমেখলা বাংলাদেশের ও নিপীড়িতা নারী সমাজের প্রতি সীমাহীন দরদ, পারিবারিক জীবনের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা এখানে পাই। আর একটি বিষয় এখানে আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। তা হল- বাংলার চাষী ঘরের ছেলেকে (মালেক) খুব সহজে 'ডি-ক্লাস' করা যায় না। এই ছেলে জীবনের বহুঘাটে জল খেয়েছে। গ্রামের অবোধ ছেলে মালেকের উত্তরণ হয়েছে সংগ্রামী শ্রমিক- চরিত্রে।"[৭১]

শ্রেণীসংগ্রামের গভীর জীবনবোধের আলোকে উপন্যাসটি মালেক চরিত্রের ক্রমোউত্তরণ তুলে ধরেছে। কারণ মালেক যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছিল সেখানে দারিদ্র্য ছিল কিন্তু তা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা ছিল না। জীবন সংগ্রামে বাস্তবতাই তাকে প্রতিবাদী হতে শিখিয়েছে। মালেকের মধ্য দিয়েই পূর্ববাংলার অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের অঙ্গিকারকে অভিজ্ঞতার আলোকে সত্যেন সেন বাস্তবরূপ দিতে চেয়েছেন। মালেকের বহুবর্ণিল জীবনচিত্রের মাধ্যমে মানুষ অনুপ্রাণিত হবে শ্রেণীচেতনাকে অস্বীকার করে বেঁচে থাকার।

ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪)

ইতিবাচক জীবনদৃষ্টির আর এক সফল সৃষ্টি আলাউদ্দিন আল আজাদের *ক্ষুধা ও আশা* উপন্যাসটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সর্বগ্রাসী ছোবলে অস্তিত্ব সংগ্রামে লিপ্ত মানুষের সামাজিক প্রতিচ্ছবি আছে এই উপন্যাসে। "যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ মহামারী যুগ সংক্ষোভ এই বিস্তৃত ক্যানভাসে রচিত *ক্ষুধা ও আশা* উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদের শিল্প চেতনা মহত্তর জীবনার্থের সাধনায় প্রাগ্রসরমান।"[৭২]

Dhaka University Institutional Repository

লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানুষের নিরন্তর বাঁচার লড়াই বিভাগোত্তর বাংলাদেশের একটি অতি পরিচিত ছবি। মানবতাবাদী চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে আলাউদ্দিন আল আজাদ পঞ্চাশের দশকের দুর্ভিক্ষ পীড়িত জীবন প্রবাহকে স্বদেশ ও স্বজাতির স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিরূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই উপন্যাসটি সাহিত্যের একটি শিল্প সফল মহাকাব্যিক উপন্যাস হিসেবে তাই সমাদৃত ।

গ্রাম ও শহরের জনজীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্রের সমন্বয়ে সুলিখিত এই উপন্যাসের কৃতিত্ব জীবন সত্যের শিল্পরূপ। বিষয় নির্বাচনে সমকালীনতা লেখকের আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তুলেছিল *ক্ষুধা ও আশা* নামের মননশীল উপন্যাস রচনায়। উপন্যাসটি মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী গ্রাম ও নগর জীবনের সমাজ বাস্তবতার প্রকৃত ছবি। যা একাধারে হানিফ, ফাতেমা, জোহা ও জহুরার মত নিম্নবর্গের মানুষের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার গল্প। অন্যদিকে সমাজের উপরতলার মানুষ মুর্তজা, রেজা কিংবা লীনার জীবনযাপনের অসামান্য সাহিত্যচিন্তন।

যুদ্ধের কারণে গ্রামবাংলার অতি সাধারণ একটি পরিবার দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে শহরে এসে কত ভাবে মানসিক এবং অর্থনৈতিক বিপর্যস্ততার শিকার হয়েছে সেই চিত্রই *ক্ষুধা ও আশা* উপন্যাসের মূল উপজীব্য। দুর্ভিক্ষের প্রভাবে অভাবের তাড়ণায় গ্রাম থেকে হানিফ তার স্ত্রী ফাতেমা, দুই সন্তান জহুরা ও জোহাকে নিয়ে শহরে এসে অনেক কষ্টে আশ্রয় গ্রহণ করে বস্তিতে। হানিফ গরীব ছিল না। তার কৃষি নির্ভর জীবন দুর্ভিক্ষের আঘাতে নিঃস্ব হয়ে পড়লে সন্তানদের মুখে দু'মুঠো ভাত তুলে দেবার আশায় স্ত্রীর পরামর্শে শহরে পাড়ি জমায়। সামান্য আশ্রয় খুঁজে পাওয়ার পরই তাদের মনে পড়ে ক্ষুধার কথা। যে ভাবেই হোক বেঁচে থাকতে হলে খেতে হবে। পরিবারের প্রধান হানিফ তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে শুরু করে সংগ্রামমুখর জীবন। হানিফের পুত্র জোহা ও কন্যা জুহুও নানা ভাবে চেষ্টা করে শহরের নতুন পরিবেশে অস্তিত্ব সংগ্রামে টিকে থাকার। কলোনিশাসিত আর্থ-সামাজিক জটিল পরিস্থিতিতে এমন অনেক পরিবারই উদ্বাস্তু হয়ে যায় সেই সময় । জোহা, জুহু, হানিফ, ফাতিমা ঠিক তেমন একটি পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করেছে উপন্যাসে। এদের প্রত্যেকের অনিবার্য জীবনসংগ্রাম তাই হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের জনমানুষের জীবন ও মৃত্যুর সামাজিক বাস্তবতা। "বিনষ্ট সমাজ, বিনষ্ট আর্থ-রাজনৈতিক এবং বিনষ্ট মানুষের নিয়ন্ত্রণে বিপর্যস্ত জীবনের গোটা ছবিই উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে। জোহার বহির্সংগ্রাম ও অন্তর্সংগ্রামের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে একটা সময় খণ্ডের অসংখ্য মানুষের জীবনরূপ। শ্রেণীচ্যুত, গ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

বিচ্ছিন্ন পরিবারের সন্তান জোহা শহরে পা ফেলেই উপলব্ধি করে এর বাস্তব ও অন্তর্শূন্য রূপ। দুঃখ ও যন্ত্রণার জটিল অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে পরিপক্ক হয়ে উঠতে থাকা জোহার অন্তর্গত একটি প্রত্যাশা ও স্বপ্নের অনুরণন শুরু থেকেই লক্ষ্য করা যায়।"[৭৩] গ্রামে সামান্য লেখাপড়া শিখতে গিয়ে জোহা যে জীবন সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছে সেই শিক্ষা দিয়েই সে মূল্যায়ন করতে পারছে শহরের কঠিন বাস্তবতাকে,

> "... সকলে তো আর মরে না । যারা বাঁচতে জানে, তারা মরবে কেন এবং বাঁচার জন্য চেষ্টা করতে হবে, সাধনা । হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। শরীরে এখনো কিছু জোর আছে, কাজের ফিকির দেখা দরকার। ভিক্ষা? এর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা, পণ্ডিত বলতেন অন্যের কাছে হাত পাতা নিজেকে ছোট করা। এতে আত্মার অপমান, সেজন্যে সত্যের পথে, পূর্ণতার পথে কেউ চলতে পারে না। মিথ্যায় ভরা দুনিয়া, কাজেই একমাত্র সংগ্রামের মধ্যেই সত্যের প্রতিষ্ঠা। সত্য মানেই সংগ্রাম।"[৭৪]

তাই শত কষ্টের মাঝেও আশা দিয়ে জোহা তার জীবনকে আলোকিত করতে চায়। ক্ষুধার অন্ন- সংস্থানের জন্য অনেক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার সম্মুখিন হতে হয়েছে তাদের। ফাতেমা ও জহু চাল, ডাল আনতে গিয়ে রাস্তার পাশের প্রকাণ্ড বাড়িটার একমাত্র বাসিন্দা বাদশার অশোভন ইঙ্গিতপূর্ণ কথা শুনেছে। যা তাদের ভাল লাগেনি। চৌধুরী মঞ্জিলে কাজ পাবার পর ফাতেমা স্বামীকে বাইরে যেতে নিষেধ করে সকালে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু সারাদিন হানিফের সময় কাটে না। সে একদিন জহুকে তেল ও 'কাহই' আনার প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ির বাইরে যায়। বাজারে গিয়ে বুঝতে পারে সে বাড়ির ফেরার পথ হারিয়ে ফেলেছে। চৌধুরী- বাড়ি থেকে ফিরে ফাতেমা স্বামীকে না পেয়ে জহুর গায়ে হাত তোলে। জহু রাগ করে ঝড়ের মধ্যে বাদশা মিঞার কাছে আশ্রয় নেয়। নরপশু বাদশা তার শ্লীলতাহানি ঘটায় এবং শেষ পর্যন্ত পতিতা পল্লীতে জহুকে স্থানান্তরিত করে। বাবার হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়া, মায়ের সাথে অভিমান করে বোনের উধাও হওয়া ইত্যাদি বিষয় জোহাকে ব্যথিত করলেও জীবন সংগ্রাম তার থেমে থাকেনি। জোহা পিতাকে খুঁজতে গিয়ে তার ছিন্নভিন্ন দেহ দেখে মাকে জানাবে কি না তা নিয়েও দ্বিধায় থাকে। শেষ পর্যন্ত চৌধুরী সাহেবের কন্যা লিনাকে পিতার গাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যুর সংবাদ জানায়। লিনার পরামর্শে মাকে পিতার মৃত্যুর সংবাদ দেয়। এরপর থেকে চৌধুরী বাড়ির ছোটখাট ফাইফরমাস খাটার জন্য সেখানেই দিন কাটতে থাকে জোহার।

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী পুত্র রেজা উচ্চাভিলাসী রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে নিজেকে পাকিস্তানের ভাবী মন্ত্রী মনে করে। অন্যদিকে তার বোন লিনা প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী আলীকে ভালবাসে। কিন্তু আলী ভালবাসে শহরের জাঁদরেল উকিল অঘোর বাবুর কন্যা সুজাতাকে। অঘোর বাবু অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হলেও আলীকে ডেকে জানিয়ে দেন সুজাতার সাথে তার মিলন কোনোপ্রকারেই সম্ভব নয়। মায়ার সঙ্গে কথপোকথনে তিনি তাঁর জীবন সত্য প্রকাশ করেছেন এ ভাবে–

> "আজকেই আমি হঠাৎ উপলব্ধি করলাম মুসলামনদের আমরা কতটা ঘৃণা করে এসেছি সেই বক্তিয়ার খিলজির গৌড় বিজয়ের সময় থেকেই। যেখানে ভালো ব্যবহার করেছি সেখানে হয় আছে কোন স্বার্থ আদায়ের চেষ্টা, কোন নিশ্চিত প্রতারণা।"[৩৫]

এদিকে পছন্দের পাত্রের সঙ্গে বিয়ে না হওয়ায় বাসর রাতে লিনা আত্মহত্যা করে। লিনার প্রেমিক আলীর মনে তখন অনুশোচনার সৃষ্টি হয়। দুর্ভিক্ষ সমসাময়িক বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থপরতা, বেঁচে থাকার নিরন্তর লড়াই, নিঃস্বার্থ সেবা, ক্ষুধা সর্বপরি নতুন আশায় বুক বেঁধে জীবনকে নতুন ভাবে সাজানোর স্বপ্নের কথাই বলা হয়েছে উপন্যাসে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে। উপন্যাসের মধ্যদিয়ে একদিকে যেমন চৌধুরী পরিবারের আলোকে শহরের অন্যান্য পরিবারের জীবনকেও তুলে ধরা হযেছে তেমনি জোহা পরিবার প্রতিনিধিত্ব করেছে সর্বহারা মানুষের যারা মানব সমাজের শোষণ ও বৈষম্য উপেক্ষা করে সংগ্রামী জীবনচেতনায় আলোকিত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। পেটের দায়ে ক্ষুধার সুযোগ নিয়ে বাদশার মত মানুষরূপী সমাজের কীট জুহুর সহজ সাধারণ জীবনটাকে কিভাবে জটিল করে তুলেছিল, তার এমন দৃষ্টান্ত মুহূর্তের জন্য হলেও পাঠককে বিচলিত করে। শুধুমাত্র ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য এক জীবনে মানুষকে কত রকম অসহায় এবং অমানবিক পরিস্থিতির শিকার হতে হয় তা সত্যিই বিস্ময়কর ও বেদনাদায়ক। জুহুর মত সহজসরল গ্রাম্য মেয়ে যখন শুধু দু'মুঠো ভাতের জন্য ধনী পরিবারে গৃহ পরিচারিকার কাজ করতে গিয়ে চোর অপবাদ নিয়ে ফিরে আসে তখন যেন এই কথা সত্যের প্রতিধ্বনি হয়ে হৃদয়টাকে নাড়া দয়। সর্বোপরি পতিতা পল্লীতে জুহুর স্থান হওয়া আমাদের সমাজ ব্যবস্থার নীচতাকে তুলে ধরে।

উপন্যাসের শেষ দিকে দেখা যায় ফাতেমা তার জীবন সংগ্রামের প্রকৃত যোদ্ধা হিসাবে বীরাঙ্গনার মত নতুন আশায় উজ্জীবিত হয়েছে। নতুন সন্তানের আগমনী বার্তা যেন এই আশাকে আরো উজ্জ্বল করে তোলে। গর্ভবতী ফাতেমা শহরে এসে অনেক সংগ্রাম করেও সুসমন্বিত জীবনের পথ নির্মাণ করতে পারেনি। তবুও আশা জেগে থাকে স্বমহিমায়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর জোহাসহ দেশে ফেরার স্বপ্ন তার জীবনকে

Dhaka University Institutional Repository

আশান্বিত করে। নতুন ধান ওঠার আশায় গ্রামে ফেরার নতুন চিন্তা ফাতেমার জীবনকে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা যোগায়।

মোহাম্মদ আলীর দ্বিধা-দ্বন্দ্বপূর্ণ প্রেমজীবন যেন আজকের সমাজ বাস্তবতায়ও সত্য হয়ে ওঠে। লিনা এবং সুজাতার প্রতি দুর্বলতা সর্বোপরি লিনার আত্মহত্যা এবং সুজাতাকেও জীবনসঙ্গী না করতে পারার ব্যর্থতা জীবনের নিয়তির অনিবার্যতা ছাড়া কিছুই নয়। না হলে লিনার মৃত্যুর সময় তার দেয়া মালা গলায় থাকা নিয়তির পরিহাস ছাড়া আর কি? লিনার ভালবাসার গভীরতা আলী বুঝতে পারে লিনার মৃত্যুর পর। তাঁর অনুশোচনা আদর্শবোধ থেকেই উৎসারিত। শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি চিন্তার উর্ধ্বে রাজনৈতিক কর্তব্যকে বড় করে দেখতে গিয়ে জেলে যায় আলী। এই চরিত্রটি উপন্যাসের সামাজিক প্রেক্ষাপটে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জোহার জীবনের সার্বিক সংকট তাকে উন্মলিত ও অসহায় করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত হারানো বোনকে খুঁজতে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। পতিতাপল্লীতে বোনের সন্ধান তাকে নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। মহামারী আক্রান্ত পরিবেশে সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানসহ এক জননীকে আবিষ্কার করে জোহা। শিশুটিকে পরম যত্নে আগলে দারুণ শীতে অন্ধকারে বসে ভোরের প্রতীক্ষায় তাদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে উপন্যাস শেষ হয়েছে।

ক্ষুধা ও আশা উপন্যাসটি দুর্ভিক্ষের প্রকৃত সামাজিক বাস্তবতা তুলে ধরেছে। মানুষের অস্তিত্ব সংগ্রামের প্রকৃত রূপ এবং সমাজ ও রাজনীতির ব্যাপক পরিসর নতুন মাত্রা পেয়েছে উপন্যাসে। আলাউদ্দিন আল আজাদ গভীর জীবনদৃষ্টি দিয়ে এ দেশের জনমানুষের যে জীবন সংগ্রাম তুলে ধরেছেন তা সাহিত্যে শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। লেখক বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন ব্যক্তির বিপর্যয়, আত্মসন্ধানের প্রয়াস, ব্যর্থতা, সর্বোপরি আশার সঞ্চারে নতুন জীবনের স্বপ্ন। জীবাভিজ্ঞার আলোকে চেনা পরিবেশ থেকে উপজীব্য সংগ্রহ করে এই উপন্যাসের ঘটনাবলী অসাধারণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ।

বরফ গলা নদী (১৩৭৬)

বরফ গলা নদী উপন্যাসটিতে জহির রায়হান নির্দয় সমাজব্যবস্থার বৈষম্যমূলক চিত্র তুলে ধরেছেন। এখানে একদিকে যেমন আছে সুবিধাবাদী চরিত্র অন্যদিকে তেমন এসেছে নিম্ন মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গের ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেছেন- "জহির রায়হানের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আমার বিবেচনায় বরফ গলা নদী । বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র এখানে পরম বিশ্বস্ততা, বাস্তববোধ, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতির সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে।"[৭৬]

জহির রায়হান এই উপন্যাসে সত্যিকার অর্থে নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের স্বপ্নের ছবি এঁকেছেন। শ্রেণী সচেতন শিল্পীর মতই তিনি কাহিনীতে সমাজের হৃদয়হীন মানুষের স্বার্থপরতা, দারিদ্র্য, অভাব-অনটন ও কষ্টের ছবি তুলে ধরেছেন। কেরাণী হাসমত আলী তার সীমিত আয়ের সংসারে পাঁচ সন্তান নিয়ে সরু নোংরা গলির জীর্ণ বাড়িতে কোনপ্রকারে জীবনযাপন করেন। ঘরে বিবাহযোগ্যা কন্যাকে পাত্রস্থ করতে না পারার যন্ত্রণা তাকে সীমাহীন আত্মগ্লানিতে নিমজ্জিত করে। দরিদ্র সংসারের একমাত্র অবলম্বন মাহমুদ অত্যন্ত সৎ। অনেক কষ্টে নিজের উপার্জিত টাকায় বি.এ পাশ করেছে। পেশায় একজন সাংবাদিক। বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক লুই ফিশার তাঁর আদর্শ। বাবা, মা, ভাইবোনসহ মোট সাত জনের পরিবার তাদের। তার বোন মরিয়ম আই. এ পাশ করার পর সংসারে স্বচ্ছলতা আনার জন্য গৃহশিক্ষিকার দায়িত্বে অর্থ উপার্জনে মনোনিবেশ করে। তাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মনসুর নামের এক তরুণ ব্যবসায়ী মরিয়মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সংসারে নানাবিধ সাহায্যের হাত বাড়ায়। মরিয়মের জীবনের দুর্ঘটনাকে মেনে নেয়ার মত উদার মানসিকতার ছিল না তার। সে শুধু মরিয়মের রূপের কাঙ্গাল ছিল। তার অন্তর্গত সৌন্দর্য দেখার কোন দৃষ্টিই তার ছিল না। তাই বিয়ের পর মরিয়মের জীবনের চরম সত্য জেনে সে মরিয়মকে তাড়িয়ে দেয়। মরিয়মের অতীতকে সে মেনে নিতে পারে না। যে রাতে মনসুর বাড়ি থেকে মরিয়মকে তাড়িয়ে দিয়েছিল সেই রাতেই বাড়ির ছাদ ধসে মরিয়মদের গোটা পরিবার করুণ মৃত্যুর শিকার হয়। মাহমুদ পত্রিকা অফিসে থাকায় তার প্রাণ রক্ষা পায়। এই যে ছাদ ধসে সম্পূর্ণ পরিবারের মৃত্যু হল এটা কোন সাধারণ ঘটনা নয়, বরং হাসমত আলীর বাড়িটা যেন শোষণমূলক কোন সমাজের বিধ্বস্ত অবস্থার প্রতীক । আর এই বিপর্যয় সমাজের লুকিয়ে থাকা সামাজিক শোষণের সৃষ্ট দূর্ঘটনা।

মনসুরের সঙ্গে মরিয়মের ঘনিষ্টতা মাহমুদ ব্যক্তিগতভাবে মেনে নিতে পারেনি। উপন্যাসের নায়ক মাহমুদের প্রগতিশীল মানসিকতা সমাজের বৈষম্যের ঘৃণ্য দিকটি সম্পর্কে সচেতন। তাই সে কথা প্রসঙ্গে মরিয়মকে তার নিজের বক্তব্য জানিয়েছে এভাবে -

"কতদিন বলেছি বড়লোকের বাচ্চাগুলোকে আমি দেখতে পারিনা, দেখতে পারিনা , আর তুমি তাদের সঙ্গে হাওয়া

Dhaka University Institutional Repository

খেতে বেরোও ?"[৭৭]

সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে মায়ের সাথেও সে মতামত ব্যক্ত করেছে মরিয়মের বিয়ে প্রসঙ্গে।

"মা তুমি বুঝবে না, মরিয়মকে ডেকে জিজ্ঞেস করো এ দেশে ক'টা লোক আছে যে তার চরিত্র ঠিক রেখে বড়লোক হতে পেরেছে? অন্যকে ফাঁকি দিয়ে ধোকাবাজি আর লাম্পট্য করে, শোষণ আর দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে টাকা রোজগার করে বড়লোক হয়েছে সব। তাদের আবার চরিত্র । ও-সব বাজে কথা আমাকে শুনিয়ো না মা । তোমাদের মেয়ে তোমরা বিয়ে দাও গে, আমার কোন মতামত নেই ।"[৭৮]

সমাজের প্রতিটি স্তরে সুবিধাবাদীরা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বাসা বেঁধেছে। বৈষম্যের ঘুন পোকা জনজীবনকে করে তুলেছে অসহায়। প্রাসঙ্গিক ভাবে তাই মাহমুদের জীর্ণ বাড়িটি ধসে পড়া তো সমাজ ভেঙ্গে পড়ার প্রতিরূপ। মনসুর সমাজের বিচ্ছিন্ন কেউ নয়, চরিত্রবর্জিত ধনী সমাজের মধুলোভী হৃদয়হীন মানুষ। মাহমুদের পর্যবেক্ষণ যে কত মর্মান্তিক ভাবে সত্য হয়েছিল, তা তাদের পরিবারের সবাই বুঝতে পারতো, যদি ছাদ ধসে তাদের মৃত্যু না হত। দরিদ্র পরিবারের সে যন্ত্রণা মৃত্যুরও অধিক বলে মনে হত ।

সমাজ সচেতনতার ক্ষুরধার দৃষ্টি দিয়ে জহির রায়হান সমাজকে বিশ্লেষণ করতে পেরেছিলেন। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের উপস্থাপনও তিনি সেভাবে করেছেন। শাহাদাত, আমেনা, নঈম, রফিক কেউই কল্পনাপ্রসূত চরিত্র নয়। তারা সবাই আমাদের সমাজের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব করেছে উপন্যাসের অবয়বে। মামুনের বন্ধু শাহাদাত ও তার স্ত্রী আমেনার উপস্থিতি উপন্যাসে অল্প সময়ের জন্য। গভীর জীবনবোধে সংগ্রামী চেতনায় তারা দু'জনই কঠিন বাস্তবের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকে। টিনের ছাপরা দেওয়া ছোট একটা প্রেসের ব্যবসা দাঁড় করানো চেষ্টা করছে শাহাদাত। তার স্ত্রী আমেনা ভাইদের অমতে তাকে বিয়ে করেছে বলে অভাবের সংসারে আত্মসম্মানবোধের কারণে বড় লোক ভাইদের কাছে কোন প্রকার সাহায্য চায় না। পুঁজি কম থাকায় বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না শাহাদাত। তাই স্ত্রীর গহনা বিক্রির টাকায় গড়ে তোলা প্রেস বিক্রির কথা ভাবছে সে। ভাইদের কাছে টাকা ধার চাওয়ার ব্যাপারে আমেনাকে শাহাদাত এক সময় অনুরোধ করেছিল। মাহমুদ জানতে পেরে বলেছে–

"ওই হারামী টাকাগুলো এনে তোমার অনেক শ্রমে গড়া প্রেসটাকে কলুষিত করো না শাহাদাত। তারচে' বিক্রি করে দাও ওটা।"[৭৯]

Dhaka University Institutional Repository

শেষ পর্যন্ত শাহাদাত প্রেস বিক্রি করে ভৈরবে একটা ষ্টেশনারী দোকান কিনেছে। প্রেসের মালিক হলো দোকানদার। তবুও আমেনা চায় না তার স্বামী কারও গোলামি করুক। আমেনা মেনে নিতে পারেনি তাদের দূরবস্থা পরিচিতি কেউ বিশেষ করে তার বড়লোক ভাইয়েরা দেখুক। আমেনার যক্ষা হলে সম্পূর্ণ পরিবার ভেঙ্গে পড়ে। মাহমুদ আশ্বস্ত করে ঢাকায় এনে চিকিৎসা করার। মাহমুদের অন্য বন্ধু নঈম জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়েছে। তার অধঃপতন এমন পর্যায়ে পৌছায় যে নিজের বাগদত্তা গর্ভবতী হয়ে পড়লে তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে এবং বন্ধু রফিককে তার সঙ্গে বিয়ের জন্য চাপ দেয়।

মাহমুদের মত সৎ এবং সংগ্রামী মানুষেরা কখনো মাথা নত করেনা অন্যায়ের কাছে। পরিবারের সবাইকে হারিয়ে শোকে পাথর হলেও নিভে যায়নি মাহমুদ। লিলির সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করেছে। বন্ধুর অসহায় পরিবারকে সাহায্য করার মানসিকতায় এগিয়ে এসেছে। রফিককে ঘৃণা করেছে দ্বিধাহীনভাবে। হাজার প্রতিকূলতার মাঝেও মানুষের জীবন থেমে থাকে না, চলে নিজস্ব গতিতে। *বরফ গলা নদী* উপন্যাসের মূল দর্শনই যেন তাই।

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০)

বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে যে উপন্যাসটি আলাউদ্দিন আল আজাদকে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে তা হল *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* । এই বিখ্যাত উপন্যাসটি লেখার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে তাঁর কয়েকজন চিত্রশিল্পী বন্ধু। ঔপন্যাসিকের নিজের ভাষ্য মতে- "মূলত, ঢাকায় চিত্রকলা আন্দোলনের কাছাকাছি আসার সুবাদে আমার কয়েকজন বন্ধু জুটে যায়। এদের মধ্যে আমিনুল ইসলাম, হামিদ, মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান ও মুর্তজা বশীর। ওদের কাছ থেকে আমি চিত্রজগৎ সম্পর্কে গল্প শুনতাম। এভাবেই এই উপন্যাস লেখার অনুপ্রেরণা।"[৮০]

সমাজ পর্যবেক্ষণের সামাজিক অঙ্গিকার ও মানসিক প্রত্যয় নিয়ে চিত্র শিল্পী জাহেদের প্রেম ভালবাসা ও জীবনযাপনের অন্যান্য অনুসঙ্গের রূপায়ণে লেখক মানব হৃদয়ের বিচিত্র রহস্যের বিশ্লেষন করেছেন। একজন প্রকৃত শিল্পীর জীবনের মহৎ অনুপ্রেরণা হচ্ছে প্রেম। প্রেমের পবিত্র শক্তিই জাহেদকে শিল্পী হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সমাজের তথাকথিত প্রচলিত মূল্যবোধকে তিনবন্ধু স্বীকার করেনা। ভেঙ্গে ফেলতে চায়। স্ত্রী ছবির ব্যক্তিগত জীবনের অজানা একটি সত্য যখন জাহেদ জানতে পারে, তখন একটি মানসিক সংকটের মুখোমুখি হয় সে। কিন্তু আত্মবিশ্বাসে অবিচল থেকে এই সংকট কাটিয়ে ওঠে সে। জাহেদ মেনে নেয় ছবির জীবনের দুর্ঘটনাকে যেখানে ছবি একান্ত অসহায় ছিল। সুস্থ জীবনবোধের অঙ্গীকারের সাথে আলাউদ্দিন আল আজাদ ইউরোপীয় মূল্যবোধের সাদৃশ্য ঘটিয়েছেন এ উপন্যাসে। উদার মনোভাবাপন্ন প্রগতিশীল জাহেদ নিজের সাথে বোঝাপড়া করেছে এভাবে-

> "নারী জীবনের সার্থকতা কোথায়? ... নারীর জীবন কি প্রেম অথবা মাতৃত্ব? প্রেম ছাড়াও মাতৃত্ব সম্ভব, কিন্তু মনে প্রেমের মধ্য দিয়ে যে মাতৃত্ব সেখানেই হয়েছে সত্য।"[৮১]

যখন ছবি স্বপ্নের মধ্যে ছোট শিশুর কান্না শুনতে পেত এবং মাতৃত্ব সুলভ চেতনায় এক স্বতন্ত্র পৃথিবীতে চলে যেত, তখন জাহেদ অতি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেছে। এই যে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে উপন্যাসে এবং তা শিল্পময় চেতনায় গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, তা সত্যিই বিস্মিত হবার মত। জাহেদের চিন্তাশীল অনুভূতির একটা পর্যায়কে ঔপন্যাসিক এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন-

> "আমি ওকে ভালোবেসেছি কিনা এটাই প্রশ্ন । যদি বেসে থাকি, তাহলে এতটুকু ক্ষমা করতে পারবো না ? বিশেষত, এযখন একটা দুর্ঘটনা মাত্র, যার আবর্তে সে একান্ত অসহায় ছিল ?"[৮২]

মুলত *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* একটি অতি আধুনিক মনোবিশ্লেষণ মূলক উপন্যাস। এক কথায় মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বললেও ভুল হবে না। এই উপন্যাসে চরিত্র রূপায়ণের চমৎকারিত্ব উপন্যাসটিকে ভিন্নমাত্রা দান করেছে। মানুষের জীবনকে এক বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন ঔপন্যাসিক।

করাচির চিত্র প্রদর্শনীতে জাহেদের প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' যার বিষয় ছিল মা ও সন্তানের পবিত্র ভালবাসার সম্পর্ক। জাহেদ ছবিটির নাম দিয়েছিল 'বসুন্ধরা'। উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করতে মানুষের হৃদয়ের গভীরতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, অস্তিত্ব ভাবনা সবকিছুরই সংমিশ্রিণ ঘটানো হয়েছে এখানে। জাহেদ, জামিল, মুজতবা সবাই তাদের কর্মতৎপরতা দিয়ে স্ব স্ব স্থান দখল করেছে। জামিলের পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা ও পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন, সবকিছুই যেন আমাদের সমাজজীবনের প্রকৃত চেহারার সাথে মিলে যায়। উপন্যাসে বিধৃত আরো একটি প্রেমকাহিনীও আমাদের হৃদয় ছুয়ে যায় বেদনায়। মুজতবার

Dhaka University Institutional Repository

সাথে তিনার ভালবাসা শেষ পর্যন্ত অনিশ্চয়তায় পর্যবসিত হয়েছে। ইতিবাচক জীবন জিজ্ঞাসায় উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটলেও আমাদের সামনে আলাউদ্দিন আল আজাদ অনেক সামাজিক সত্যকে তুলে ধরেছেন গভীর দূরদৃষ্টির সঙ্গে।

উত্তম পুরুষ (১৯৬১)

রশিদ করিমের *উত্তম পুরুষ* উপন্যাসটি পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়। সমকালের কিছু রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করে রশিদ করিম তাঁর উপন্যাসে পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ের জীবন ধারাকে তুলে ধরেছেন যা তৎকালীন সামাজিক বাস্তবতার চরিত্র উন্মোচন করে।

উপন্যাসের নায়ক শাকের পারিবারিকভাবেই ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। উপন্যাসের শুরু শাকেরের কৈশোরের কাহিনী দিয়ে এবং শেষ হয়েছে তার বিশ বছর অর্থাৎ যুবক বয়েসে। উত্তম পুরুষেই উপন্যাসের বক্তব্য শুরু শাকেরের ভাষ্য দিয়ে–

> "আমি সবসময় উত্তম পুরুষ। কিন্তু কাহিনীকার স্বয়ং যখন 'আমি' তখন তাকে অধমও হতে হয়। তা' না হলে হয়তো তার নিজের মর্যাদা থাকে কিন্তু সত্যের থাকে না।"[৮৩]

সে মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারের সমুদয় বৈশিষ্ট্য বহনকারী একজন প্রতিনিধি। এখানেও সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষ আর দ্রব্যমূল্যের চাপে শাকের পিতা সরকারী কর্মকর্তা হয়েও দীনহীন অবস্থায় সংসার চালিয়েছেন। পারিবারিক অস্বচ্ছলতা শাকেরকে বন্ধুদের মধ্যে সদা বিচলিত ও অপ্রস্তুত করে। হিন্দু বন্ধুদের সাথে মিশতে গিয়ে সে অবহেলার স্বীকার হয়। দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষয়ে শাকেরের ধারণা এক কথায় সাম্প্রদায়িক বিভেদ। শাকেরের বন্ধুদের আলাপচারিতায় নিচের সংলাপ থেকে তা আরও স্পষ্ট হয়। মহেন্দ্র শিশিরকে বলল -

> "একগ্লাস জল খাওয়া তোরে ! 'তৎক্ষণাৎ ভিতর থেকে কাঁসার গ্লাসে এক গ্লাস পানি এল'। এবার আমি (শাকের) বললাম, 'আমিও খাব'। হঠাৎ শিশিরের মুখ শুকিয়ে গেল- আমার কণ্ঠের চাইতেও শিশিরের মুখ অধিক শুষ্ক মনে হচ্ছিল। সে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে আমতা আমতা করে কোন মতে বলল, 'জল কি খাবি ! চল, তোকে ভাল জিনিস খাওয়াব। পাশের দোকানে চল, বোতল থেকে লেমনড খাবি'।"[৮৪]

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গত কারণেই শাকের পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম লীগ এবং মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র সমর্থক কিন্তু পৃথক রাষ্ট্রে সে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন এবং হিন্দু-মুসলিমের সহঅবস্থান কামনাকারী। উপন্যাসে শাকেরকে পরিণত বয়সের মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়নি। তাই তার চিন্তা চেতনা অনেকাংশই বিভ্রান্তিমূলক, ভুল ধারণাপ্রসূত। বন্ধুর বোন চন্দ্রাকে ভালবেসে সে নিজের করে গ্রহণ করতে পারেনি।হয়তো সাম্প্রদায়িক চেতনা তার প্রেমকে স্থায়ী রূপ দিতে পারে নি। বয়সের অপরিপক্কতায় তার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার আবেগের সঞ্চার হয়েছে। যা উপন্যাসের বাস্তবতাকে অনেকাংশে ব্যাহত করেছে। শাকেরের দূরসম্পর্কীয় ভাবীর স্নেহ ভালবাসাকে সে সংযমের সাথে গ্রহণ করতে পারেনি। পরবর্তীতে অবশ্য সে বিবেকের দংশনে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সুস্থ জীবনবোধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছে। এই উপন্যাসের সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র সেলিনা, দোষে গুণে একজন পরিপূর্ণ মানুষ। শাকেরের বন্ধু মোশতাকের বোন সে । শাকেরের সাথে তার সম্পর্কের মধ্যে এক ধরনের রহস্যময়তা আছে। দুজনের পালিয়ে গিয়ে বিয়ের সম্মতি এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিসের এক দুর্নিবার আকর্ষণে সেদিন সেলিনার ঘরে যেতেই সেলিনার মতের পরিবর্তন এই কথাকেই সমর্থন করে-

> " অন্ধকারের বুক চিরে ঝনঝন করে শব্দ উঠল। তৎক্ষনাৎ সেলিনা বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে আলো জ্বালিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার " কে কোথায় আছ। তাড়াতাড়ি এসো। দেখ, শাকের এত রাত্রে আমার ঘরে কি করছে।"[৮৫]

সেলিনার এই নাটকীয় পরিস্থিতির অবতারণা উচ্চবিত্তের খেয়ালী মানসিকতার পরিচয়বাহী। যেহেতু সেলিনার অতীতের অনেক কথাই শাকের জেনে গেছে তাই শাকেরের কথা যেন কেউ বিশ্বাস করতে না পারে সেই জন্য সেলিনা এই কৌশলের আশ্রয় নিয়ে শাকেরকে লাঞ্ছিত করে।

উপন্যাসের শেষে দেশভাগের পর শাকের পূর্ব পাকিস্তানে পাড়ি জমায়। এই উপন্যাসে রশীদ করিম দেশের রাজনৈতিক পটভূমিতে শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর পরিবারের চিত্র তুলে ধরতে দক্ষতা দেখিয়েছেন। কলকাতর উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত পরিবারের ছবি তিনি অত্যন্ত খোলামেলাভাবে পাঠকের সামনে পেশ করেছেন। সেলিনার জীবনাচরণের মধ্যেই সে কথার প্রমাণ নিহিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে সৃষ্ট সমাজ জটিলতা, নৈতিক অবক্ষয় সবকিছুই ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন কিশোর শাকেরের জীবনবোধের মধ্যদিয়ে। সে কারণে তৎকালীন সময়ের সামাজিক ছবিটা পরিপূর্ণ ভাবে বর্ণিল হয়ে ওঠেনি লেখকের গভীর উপলব্ধিবোধের কারণে। উপন্যাসের মূল কাহিনী আবর্তিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক চেতনার মূল থেকে, এমনটা

Dhaka University Institutional Repository

মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় তাই সেই অর্থে উপন্যাসটিকে সার্বিকভাবে সার্থক উপন্যাস বলা যাবে না। তবে চরিত্রের বিশ্বস্ত রূপায়ণ উপন্যাসটিকে নবমাত্রা দান করেছে।

প্রসন্ন পাষাণ (১৯৬৩)

রশিদ করিমের দ্বিতীয় উপন্যাস *প্রসন্ন পাষাণ*। *উত্তম পুরুষ* ছিল নায়ক প্রধান কাহিনী। আর *প্রসন্ন পাষাণ* মূলত নায়িকা প্রধান কাহিনী বললে ভুল হবে না। উপন্যাসের নায়িকা তিশনার জীবন কাহিনী সেই উত্তম পুরুষেই বর্ণিত হয়েছে।

অবিভক্ত বাংলার পটভূমিতে উপন্যাসের মূল কাহিনীতে দেখা যায় তিশনার পিতা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে মফঃস্বল শহরের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত থাকেন। তিশনা থাকে কলকাতার পার্ক সার্কাস অঞ্চলে চাচা ও ফুফুর সাথে। তিশনার জীবনে এদের দু'জনের প্রভাবও তাই কম নয়। দূর সম্পর্কের ছোট ফুফুর জন্য ছোটচাচার মানসিক পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসে তাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডাংশ রচিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক সচেতনভাবে তিশনার জীবনালেখ্য আলোচনা করতে গিয়ে উপন্যাসে অন্যান্য চরিত্রের অবতারণা করেছেন। এদেরকে ঘিরেই তিশনার জীবনকাহিনী অগ্রসর হয়েছে। তাই উপন্যাসের কোন ঘটনা বা চরিত্রকে আলাদা করে দেখার অবকাশ নেই। প্রতিটি বিষয়ই তিশনার জীবনের সামগ্রিকতার সঙ্গে মিশে আছে। তিশনার প্রতি আলীমের আর্কষণের প্রেক্ষিতে কামিলের প্রতি তিশনার দুর্বলতা প্রকাশ এবং সম্ভাব্য দারিদ্র্যের কারণে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় কামিলের পরিবর্তে, আলীমকে স্বামীরূপে গ্রহণের মধ্য দিয়ে তিশনার মনোজগতের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসের শেষে অবশ্য তিশনা কামিলের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেও কামিল তাকে প্রত্যাখ্যান করে। অন্যদিকে ছোট ফুফুকে ঘিরে ছোট চাচার প্রেম এবং সন্তানের কাছে ধরা পড়ার পর ছোট ফুফুর সামগ্রিক জীবনধারাও উপন্যাসের আলোচ্য বিষয়বস্তুতে প্রাধান্য লাভ করেছে। তিশনার পিতার পুনর্বিবাহ পরবর্তীতে তিশনার আলীমের বিবাহিত জীবনে সন্তান লাভ সবকিছুই উপন্যাসের আবেদনকে হয়তো ভিন্নমাত্রা দিয়েছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে উপন্যাসটিকে সার্থকতা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সমাজে নারীকে একটি বিশেষ জায়গা থেকে দেখার অবকাশ হয়তো আছে উপন্যাসে কিন্তু জীবনের সব ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভাব কাহিনীকে দুর্বল করে দিয়েছে। তৎকালীন

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই তেমন উজ্বল হয়নি। অবশ্য লেখক উপন্যাস রচনার সময় তাঁর মত করে কাহিনী পরিকল্পনা, চরিত্র নির্মাণ এবং বিভিন্ন চরিত্রের সামাজিক অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। সেই বিচারে *প্রসন্ন পাষাণ* বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র স্থান করে নিয়েছে।

এক মহিলার ছবি (১৯৫৯)

দেয়ালের দেশ এর মত সৈয়দ শামসুল হকের *এক মহিলার ছবি* উপন্যাসটিও নারী চরিত্র কেন্দ্রিক। নারী জীবনে রোমান্টিকতা, বাস্তবতা, দ্বন্দ্ব, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা এক মহিলার ছবি উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের মূল চরিত্র নাসিমার জীবনকাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়েই তার জীবনের পাওয়া না পাওয়ার সত্যকে ঔপন্যাসিক এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে উন্মোচন করেছেন।

নাসিমার জীবনের প্রাপ্তিগুলো যেন শূন্যতার মধ্যদিয়েই প্রবাহিত। প্রেম ও ভালবাসা , সংসার, স্বামী, মাতৃত্ব- কিছুই তার জীবনে স্থায়িত্ব লাভ করেনি। জীবনাভিজ্ঞতায় নাসিমা জেনেছে প্রেমের অপর নাম মিথ্যাচার। যে মূল্যবোধ নিয়ে নাসিমা বেড়ে উঠেছে জীবনের সংজ্ঞার্থে তার পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন। সংসারজীবনে স্বামীর অবজ্ঞায় নিজেকে সে বিপন্নবোধ করে। "কলকাতায় প্রবীরের কাছেও সে প্রেম ও শুশ্রূষার জন্য আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিল কিন্তু তার মধ্যও মনোহীন দেহসম্ভোগের উগ্র হিংস্ররূপ প্রত্যক্ষ করে সরে আসতে বাধ্য হলো। ... সিন্ধি যুবক জাওয়াদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে জাওয়াদের কাছেও প্রেমহীন আত্মনিবেদনের জন্য চরম মূল্য দিতে হয় তাকে ... প্রাণের রক্ষা পেলেও বিনষ্ট হলো তার গর্ভস্থ সন্তান।"[৮৬]

মাটিতে লুটিয়ে থাকা লতার মতই নাসিমার জীবন। কোন অবলম্বন না পেয়ে ঠিক মত যেন দাঁড়াতে পারে না। শেষ পর্যন্ত বেবী নামের এক তরুণ তার মাতৃত্বের স্বাদকে পূর্ণতা দিয়েছে-

"আমাকে তোর কি মনে হয় বেবী ?
বেবী গভীর চোখে তাকিয়ে রইল শুধু। নাসিমা তখন যোগ করল
আমাকে তুই ঘৃণা করবি ? – যেমন সবাই আমাকে করে ?
না।
সত্যিই ? – আমাকে তোর ভয় হয় না ?
কেন ?

Dhaka University Institutional Repository

আমি যে অমঙ্গল।
হোক। তুমি আমার মা
নাসিমার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আলোর মত।"[৮৭]

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির এই উপন্যাসটি সৈয়দ শামসুল হকের অবচেতন আকাঙ্ক্ষাপীড়িত বিকৃত বিপন্ন নাগরিক জীবনের ছবি। তবে লেখক উপন্যাসের অবয়ব সৃষ্টিতে ব্যতিক্রমী অবদান রেখেছেন।

দেয়ালের দেশ (১৯৫৯)

নারীর মাতৃকাঙ্ক্ষার চিরকালীন সহজাত প্রবণতাকে বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *দেয়ালের দেশ* উপন্যাসে। বিভাগোত্তর কালের আধুনিক উপন্যাসে নারীর এই একান্ত চেতনা সাহিত্যে নতুন মাত্রা পেয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক মূলত নগরজীবনের গল্পের ভাষ্যকার। সঙ্গত কারণেই এই উপন্যাসে পঞ্চাশের দশকের আধুনিক মধ্যবিত্তের প্রেম ও জৈব বাসনার প্রতিফলন ঘটেছে। উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র তাহমিনা। সে ফারুককে ভালবাসলেও বিয়ে হয় আবিদ নামের অন্য এক ব্যবসায়ী যুবকের সাথে। বিয়ের তিন বছর পর তাহমিনা বুঝতে পারে তার স্বামী আবিদ পিতৃত্বে অক্ষম। তাই স্বামীর পবিত্র প্রেমাকর্ষণকে অস্বীকার করে অসুস্থ স্বামীকে হাসপাতালে রেখে পূর্ব প্রেমিক ফারুকের কাছে চিঠি লেখে। আবিদের নির্জন বাংলোয় দু'জনের দেখা হয় এবং এই নির্জনতায় তাহমিনার মাতৃত্ব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা লাভ করে। তাহমিনা আবিদের সংসার ত্যাগ করে ফারুকের কাছে আশ্রয় নেয়। শুধু মাত্র মা হওয়ার চিরবাসনা থেকে তাহমিনা স্বামী, সংসার ত্যাগ করে। ফারুকের সহচার্যে এক পুত্র সন্তানের জননী হিসেবে নিজের মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করে। ঘটনাক্রমে আবিদ একদিন তাঁর স্বামীত্ব এবং অবৈধ সন্তানকে স্বীকার করার দাবী নিয়ে তাহমিনার সঙ্গে দেখা করে। আবিদের প্রতি তাহমিনার অন্তর্জগতে তখনো ভালোবাসার অনুভূতি অক্ষয় ছিল কিন্তু এই জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলার মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। তাই সে দ্বৈত-ভালোবাসার দ্বিধা-সংশয় কাটিয়ে উঠতে পারে না। সিদ্ধান্তহীনতার টানাপোড়েনে ক্ষত-বিক্ষত হয় তার হৃদয়। এ পর্যায়ে মনে হয়েছে তার প্রেমাবেগ যেন মাতৃত্বের অনুভূতিকে অতিক্রম করে গেছে। আবিদকে দেখে তার হৃদয়ে সহানুভূতি জেগেছে -

Dhaka University Institutional Repository

"তাহমিনা জোর করে চোখ ফিরিয়ে নিতে চাইল আবিদের শরীর থেকে। কিন্তু পারল না । আগের চেয়ে, এই প্রথম তার চোখে যেন পড়ল, অনেক কৃশ হয়ে গেছে আবিদ। আর ওর ডান পায়ে কি সেই দুর্ঘটনার চিহ্ন এখনো আছে ? ও কেন একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে ? ক্ষোভ হলো ঈশ্বরের উপর, কেন তিনি ওকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিলেন না ?

হঠাৎ চমক ভাঙ্গল তার, একি ভাবছে সে। ... কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে চাইল তার আত্মা । ... কেন - কেন সে তাদের দু'জনকেই ভালোবাসতে পারে না ? ফারুক আর - আর আবিদ। তার সমস্ত হৃদয় যেন কথা হয়ে তার অবাধ্য এই কণ্ঠের আশ্রয় মিনতি করল-- আবিদ আমি তোমাকে ভালোবাসি। আবিদ আমি তোমারই।"[৮৮]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে প্রেম কিংবা মাতৃত্ব কোনটাই তাহমিনার কাছে শেষ পর্যন্ত একক গুরুত্ব পায়নি। এক সময় মাতৃত্বের কারণে যে স্বামীর সংসার ছেড়েছিল, সে-ই আবার স্বামীর প্রতি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছে। আবিদ তার স্বামী। ফারুক তার সন্তানের পিতা, এই বোধোদয় তাকে বিচলিত করেছে। অদ্ভুত চারিত্রিক ক্রিয়াকর্ম তাহমিনার। উপন্যাসে কাহিনীর প্রয়োজনে ঔপন্যাসিক রোমান্টিক ভাববিলাসকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪)

সৈয়দ শামসুল হকের *সীমানা ছাড়িয়ে* উপন্যাসটি বিষয় বিভাগপূর্ব কাল থেকে শুরু করে বিভাগোত্তর কালের পূর্ববাংলার পটভূমিতে শেষ হয়েছে। তাঁর আগের দুইটি উপন্যাস যথাক্রমে *দেয়ালের দেশ* ও *এক মহিলার ছবি* র কাহিনী থেকে এই উপন্যাসের কাহিনী অনেকটা স্বতন্ত্র। রোমান্টিক ধাচে লিখিত হলেও লেখকের সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় এই উপন্যাসে।

মাতৃহীন জরিনা নতুন মা ঘরে আসায় সে আরও বেশি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। চাচা আলী জাহ তাকে সস্নেহে সঙ্গ দেয়। জরিনা উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হলেও জরিনার জীবন সে অর্থে সংগ্রামী নয়। সেই তুলনায় উপন্যাসে অল্প পরিসরে জরিনার চাচার জীবন সংগ্রামের কথা সৈয়দ শামসুল হক সচেতনভাবে তুলে ধরেছেন। আলী জাহ দীর্ঘদিন থিয়েটারে অভিনয় করে যশ লাভ করে। কিন্তু তার শিল্পীমন কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। একটি ভাল ছবি বানানোর আশায় সে পাকিস্তান যায়। অর্থাভাবে দীর্ঘদিনের সাধনা বাস্তবে রূপ

Dhaka University Institutional Repository

নেয়ার ঠিক আগমুহূর্তে মালিকের সাথে মতান্তর ঘটলে প্রায় সমাপ্ত হওয়া ছবি পরিত্যাগ করে ঢাকায় ফিরে আসে সে। পাকিস্তান থেকে আলী জাহ ফিরে এসে বড় ভাই সাদেক আলীর সামনে দাঁড়ায় –

> কোথায় গেল আপনার সংগ্রাম ?
>
> আপনার লক্ষ্যের জন্য নিষ্ঠা ? নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন । বলুন আপনি এই কথা গুলো । কেন হাত গুটিয়ে বসে আছেন ? মন্ত্রীত্ব যাবার পর, ইলেকশনে আপনাদের সেই জাতীয় পার্টি হেরে যাবার পর, দিন্তে দিন্তে অসার বিবৃতি বকুনি ছাড়া আর কি করেছেন আপনি ? কোথায় আপনার আদর্শ ?"[৮৯]

এভাবেই উপন্যাসে সমসাময়িক সামাজিক জীবনের চিত্র ঔপন্যাসিকের হাতে জীবন ও নীতিবোধে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন (১৯৬২)

কথা সাহিত্যিক আলাউদ্দিন আল আজাদের *শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন* মনোবিশ্লেষণের নিপুণতার এক অভিনব উপন্যাস। যুদ্ধোত্তর ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের উপস্থাপনে শিল্পকুশলতার পরিচয় আছে এই উপন্যাসে। বিধবা বিলকিস বানুর চরিত্রের রূপায়ণে লেখক যে জীবনদৃষ্টির আশ্রয় নিয়েছেন তাতে মানুষের অবচেতন আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে সচেতন ভাবেই । স্বামীর সঙ্গে ভালবাসাহীন সংসারে দুই সন্তানের জননী বিলকিস বানু। দাম্পত্য সম্পর্ক যাদের মধ্যে খুবই শীতল অনুভূতি সম্পন্ন ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর একটা আবেগহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। বাচ্চাদের নার্সারী স্কুল এবং দুই সন্তানকে নিয়ে তার আপন ভুবন তৈরি হয়।

বিলকিসের এই রুটিন মাফিক জীবনে আবেগিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটে তার কন্যা পারভিনের ভাবী স্বামী কামালকে কেন্দ্র করে। কামাল তার খালাত বোনের ছেলে। যাকে লেখাপড়ার সুবিধার্থে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেয় এবং মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। "পারভীন-কামালের বিবাহ পূর্ব ঘনিষ্ঠতার প্রেমময় প্রকাশ প্রত্যক্ষ করে দগ্ধীভূত হয় বিলকিসের নিঃসঙ্গ অন্তর্লোক। ঔপন্যাসিক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিলকিসের জটিল চেতনাপ্রবাহকে উপস্থপন করেছেন। কিন্তু শিল্পের সীমাকে অতিক্রম করেননি। লিবিডোর তাড়না এবং সুপার

Dhaka University Institutional Repository

ইগোর নিয়ন্ত্রণের দ্বন্দ্ব ক্ষতবিক্ষত করে দেয় বিলকিসের অন্তর্জগত। এবং পরিণামে সে জীবনের শীতার্ত বাস্তবতাকে বরণ করে নেয় অসঙ্কোচে।"[৯০] কঠিন বাস্তবতার কথা স্মরণ করে বিলকিস তার আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করে। তার এই অন্তর্জালা আলাউদ্দিন আল আজাদ ফুটিয়ে তুলেছেন দীর্ঘ সাহিত্য সাধনার বর্ণনাভঙ্গি এবং ভাষাকৌশলের মাধ্যমে। সমাজকে পর্যবেক্ষণ ও মানুষের জীবনকে তিনি অবলোকন করতেন গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে।তাই বিলকিসের মাধ্যমে লেখক এমন কিছু সৃষ্টি করেননি যা উপন্যাসের বক্তব্যকে খাটো করে দেয়। বিলকিস তার অবদমিত মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে সময়োচিত ইতিবাচক ভাবনা দিয়ে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছে। যা তার স্কুলের সবুজ ঘাসের সজীবতার প্রতীকে সুস্থ জীবনচেতনায় অঙ্গীকারপূর্ণ । বিলকিস বানু যেন তাঁর জীবনের সব চাওয়া পাওয়াকে পরিপূর্ণ করতে চেয়েছে স্কুলের কচি কচি মুখ গুলির ভিতর দিয়ে। বিলকিসের জীবনের গভীরতম সুখ দুঃখকে লেখক সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

সর্বোপরি একজন নিঃসঙ্গ নারীর রিক্ত ও শূন্য যৌবনের অন্তরিত দীর্ঘশ্বাস রূপায়ণে অন্তর্গত স্বগত কথনরীতির ব্যবহারও এ উপন্যাসে শিল্প সার্থকতা লাভ করেছে । বিকৃত যৌনাকাঙ্ক্ষা থেকে বাস্তব জীবনার্থের মধ্য দিয়ে শীতের কুয়াশা ভেদ করে লেখকের দূরদৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে বসন্তের প্রথম ভোরের সূর্যালোকে।

শেষ বিকেলের মেয়ে (১৩৬৭)

শেষ বিকেলের মেয়ে উপন্যাসটি জহির রায়হানের এমন এক কাহিনী যেখানে জনজীবনের অবিকৃত জীবনধারা সৃষ্টির দক্ষতায় উজ্বল হয়ে উঠেছে। অতি সাধারণ রোমান্টিক উপন্যাস বলে মনে হলেও, সত্যিকার অর্থে উপন্যাসটি তাঁর প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতার ফসল। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র তাই নিজস্ব অবস্থানে বাস্তব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

অফিসে সীমিত আয়ের কেরাণির চাকরি করে উপন্যাসের নায়ক কাসেদ। সে একজন কবি। সংসারের কোন জীবনজটিলতা তাকে স্পর্শ করেনা। বিধবা মা আর দূর সম্পর্কের মাতৃ-পিতৃহীনা এক খালাতো বোনকে নিয়ে তার পরিবার। নাহারকে নিজের সন্তানের মতই স্নেহ করেন কাসেদের মা। নাহার নীরবে ভালবাসে কাসেদকে। এই বাস্তবতা কাসেদ কখনো বুঝতে পারেনি, বুঝতে চায়নি। মধ্যবিত্ত

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের মেয়ে জাহানারাকে ভালবেসে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে সে। কিন্তু কখনো মুখ ফুটে সে কথা বলতে সাহস পায়নি জাহানারাকে। মনের জটিল দ্বন্দ্বময় রূপটিই তার কাছে মুখ্য হয়েছে। অনুভূতিপ্রবণ মানসিকতার কাসেদ তার অপ্রকাশিত প্রেম নিয়ে অনেক মানসিক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছে। জাহানারার কাছে এক প্রকার প্রত্যাখ্যাত হয়ে জাহানারার আত্মীয় শিউলিকে আবেগের বশবর্তী হয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। শিউলি ছেলেমেয়ের বন্ধুতে বিশ্বাসী হলেও বিয়েতে তার আগ্রহ নেই। তাই শিউলিও তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এদিকে নাহারকে ভাল পাত্রস্থ করতে সদা চিন্তাযুক্ত থাকেন কাসেদের মা। ঘরকন্যায় নিপুণ এই ভাল মেয়েটির বিয়ের জন্য তিনি বিভিন্নভাবে পাত্রের সন্ধান করেন। কাসেদের খালু এই পরিবারের ভালমন্দের খোঁজ খবর রাখেন।

অন্যদিকে কাসেদের অফিসের বড় সাহেবের জীবন সংগ্রামের কথা জহির রায়হান গুরুত্বের সঙ্গে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। বড় সাহেব অনেক সংগ্রাম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

> "বাবা বড় গরীব ছিলেন। প্রাইমারী স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার। বেতন পেতেন মাসে পনের টাকা। তাও নিয়মিত নয়।...
>
> দূর গাঁয়ে জায়গীর থাকতেন বড় সাহেব। তিন মাইল পথ পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতেন। ফিরে আসতে অনেক রাত হয়ে যেতো। তখন দু'পায়ে ব্যথা করতো ভীষণ।
>
> পরের বাড়ীতে ঠিক মত খাওয়া জুটতো না। বই কেনার পয়সাও ছিল না তার। সহপাঠিদের কাছ থেকে চেয়ে এনে পড়তেন। রাত জেগে পড়বার উপায় ছিলো না। ওতে তেল খরচ হয়। তেল কেনার টাকা কোথায় ?
>
> তবু কোনদিন দমে যাননি বড় সাহেব। হতাশা আসতো মাঝে মাঝে, তখন চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতেন তিনি। কান্না পেত, কাঁদতেন, চোখের পানি ধীরে ধীরে চোখেই শুকিয়ে যেতো।"[৯১]

ব্যক্তিজীবনের কথা বলে বড় সাহেব এ ভাবেই সবাইকে অনুপ্রাণিত করতেন কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়ার জন্য। অফিসের মকবুল সাহেব পঞ্চাশোত্তর বৃদ্ধ। এই বয়সেও অবিবাহিত তিন মেয়ে, নাতি-নাতনী নিয়ে বড় সংসারের হাল ধরে আছেন। দারোয়ান খোদাবক্সের মধ্যে দিয়ে সমকালীন সময়ের নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের ছবি উপন্যাসে এসেছে এভাবে–

> "মেরা দরখাস্ত কা কুচ্ হুয়া সাহাব ? কিছুদিন আগে বেতন বাড়াবার জন্যে বড় সাহেবের কাছে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলো সে। দু'টি বউ আর এক ছাগলের সংসার পঞ্চাশ টাকায় চলে না তাই লিখে জানিয়েছিলো।"[৯২]

Dhaka University Institutional Repository

কাসেদ মৃদু হেসে তাকে সান্ত্বনা দেয়। কাসেদের ধারণা, বড় সাহেব জীবন সংগ্রামে খেটে খাওয়া এই সব মানুষের দুঃখ বোঝেন। কিন্তু এত কষ্টের পরও বড় সাহেব ব্যক্তিগত জীবনে সুখী হতে পারেননি। স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে। এই নিয়ে অফিসে অনেক মুখোরোচক ঘটনার জন্ম নিয়েছে। বড় সাহেব পুনরায় মকবুল সাহেবের মেজ মেয়েকে বিয়ে করেছেন।

মায়ের মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ একা হয়ে যায় কাসেদ। শেষ পর্যন্ত নাহারের নীরব ভালবাসার কাছে আত্মসমর্পণ করে। কাসেদের খালু নাহারকে বিয়ে দেয়ার জন্য তাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের আগের দিন নাহার কাউকে কিছু না জানিয়ে কাসেদের কাছে চলে আসলে কাসেদ অবাক হয়। বলে–

> "কাল তোমার বিয়ে আর আজ হঠাৎ এখানে চলে আসার মানে ?
>
> নাহার নির্বিকার গলায় বললো, বিয়ে আমার হয়ে গেছে।
>
> কার সাথে ? ...
>
> যার সাথে হয়েছে তার কাছেই তো এসেছি আমি। তাড়িয়ে দেন তো চলে যাই।
>
> কাসেদ বোবার মত ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে রইলো ওর হলুদ মাখানো মুখের দিকে। কিছুতেই সে ভেবে পেলো না, সেই চাপা মেয়েটা আজ হঠাৎ এমন মুখরা হয়ে উঠলো কেমন করে ?"[৯৩]

জহির রায়হান তাঁর উন্নত জীবনবোধ দিয়ে একটি সাধারণ কাহিনীকে অসাধারণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। বাস্তবতা বিবর্জিত কল্পনাপ্রসূত কোন কিছুই উপন্যাসটিকে হালকা করে দেয়নি। *শেষ বিকেলের মেয়ে* উপন্যাসের কাহিনীতে তিনি সামান্যের আলোকে বিশেষকে স্থান দিয়েছেন । উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগ কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেনি বলেই তাঁর উপন্যাস হয়ে উঠেছে অসামান্য শিল্পবোধের পরিচায়ক। নিজের জায়গা থেকে তিনি বাস্তবতাকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। কাসেদের বাইরের এবং ভেতরের রূপটিকে বর্ণনা করেছেন জীবন চেতনার আলোকে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম-নগর মিশ্র জীবন ভিত্তিক উপন্যাস

কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শেষ উপন্যাস *কাঁদো নদী কাঁদো*, তাঁর আগের দুটি উপন্যাস যথাক্রমে *লালসালু* এবং *চাঁদের অমাবস্যা* য় তিনি সামাজিক সচেতনতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তাতে এক নতুন মাত্রা দান করেন। "ব্যক্তি ও সমষ্টি, অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন, অনস্তিত্ব ও অস্তিত্বের সমগ্রতায় নির্মিত হয়েছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসের অবয়ব। সমাজ বিবর্তন ও মানুষের অস্তিত্ব জিজ্ঞাসার রূপ-রূপান্তরের যে নিগূঢ় সাক্ষ্য তার 'লাল সালু' এবং চাঁদের অমাবস্যায় বিধৃত, তারই পূর্ণতর অভিব্যক্তি ঘটেছে *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসে । এ উপন্যাসের জটিল আঙ্গিকে তিনি ধারন করেছেন সময়, সমাজ ও জীবনের জটিলতার স্বভাব ধর্ম এবং মানুষের অস্তিত্ব-সংগ্রামের টানাপোড়েন ও রূপবৈচিত্র্য"[৯৪]

কাঁদো নদী কাঁদো উপন্যাসটিও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বিশ্বজনীন চেতনায় সমৃদ্ধ পুর্ণাঙ্গ অস্তিত্ববাদী উপন্যাস। বাংলা কথাসাহিত্যে এই উপন্যাসের আধুনিকতার সাথে কোন উপন্যাসের তুলনা দেয়া যাবে না।

49658

যে চাঁদবরণ ঘাটে মুহাম্মদ মুস্তফা বড় হয়েছে সেটি একটি গ্রাম এবং কুমুরডাঙ্গা একটি মফস্বল শহর যা সামন্তবাদের কালো থাবায় সম্পূর্ণ আধুনিকতা বিবর্জিত। নিষ্ঠুরতা ও শ্রেণীবৈষম্য যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মুহাম্মদ মুস্তফা নিজের চেষ্টায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করে কুমুরডাঙ্গার ছোট হাকিম হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। তার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু তসলিমের মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী আশরাফ হোসেন চৌধুরীর তৃতীয় কন্যার সাথে মুহাম্মদ মুস্তফার বিয়ের দিন ধার্য হয়। এই শুভসংবাদই উপন্যাসে মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনে দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে আসে। বিয়ের তারিখ জানিয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা বাড়ীতে মায়ের কাছে চিঠি লেখে। প্রতিউত্তরে তার ফুপাত বোন খোদেজার পুকুরে ডুবে আত্মহত্যার দুঃসংবাদ পায়। শুরু হয়ে যায় মুহাম্মদ মুস্তফার মনোজগতে এক দ্বান্দ্বিক বাস্তবতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। কারণ তার বিধবা ছোট ফুফু যখন তাদের বাড়িতে ছয়-সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে খোদেজাকে নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন মুহাম্মদ মুস্তফার বাবা বোনের দুঃখে কোন এক দুর্বল মুহূর্তে মুহাম্মদ মুস্তফার সাথে খোদেজার বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বোনকে। নানাবিধ আচরণের মধ্য দিয়ে হয়তো তখন এই প্রতিশ্রুতিতে পরোক্ষভাবে মুহাম্মদ মুস্তফার সম্মতি আছে বলেই ধরে নিয়েছিল খোদেজা। তাই মুহাম্মদ মুস্তফার অন্যত্র বিয়ের সংবাদে সে আত্মহত্যা করে।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত মুহাম্মদ মুস্তফার অবচেতন মনের অপরাধবোধের অন্তর্দ্বন্দ্বই তাকে জীবনের শেষ পরিণতির দিকে ধাবিত করেছে। বিয়ের নির্ধারিত তারিখ পিছিয়ে দিয়ে কুমুরডাঙ্গা থেকে ঢাকা যাবার পথে মুহাম্মদ মুস্তফার প্রচণ্ড জ্বর হয়। ফলে সে নির্ধারিত দিনটিতে বিবাহ-মজলিসে স্বাভাবিকভাবেই হাজির থাকতে পারেনা। একের পর এক এই সব অযাচিত ঘটনায় মুহাম্মদ মুস্তফা নিজেকে খোদেজার হত্যাকারী বলে ভাবতে থাকে। খোদেজার করুণ পরিণতি তার অন্তর্লোকে গভীরভাবে রেখাপাত করে। বিবেকের দংশন থেকে সে কিছুতেই মুক্তি পায় না। মনস্তাপে দংশিত হয় প্রতিনিয়ত।

> "তার মনে হয় যে মেয়েটি আত্মহত্যা করে একটি প্রতিহিংসা পরায়ণ আত্মায় পরিনত হয়েছে, তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করতে শুরু করেছে । সে-ই দায়ী তার বিভ্রান্তির জন্যে, সে-ই তাকে মৃত্যুর দ্বারে নিয়ে গিয়েছিলো, তার কার্যকলাপ আর ক্ষমতার অধীন নয়, মেয়েটির আত্মা তার মন দখল করে তার ইচ্ছাশক্তি কাবু করে ফেলেছে, তাকে পরিচালিত করেছে নির্দয় ধ্বংসকারিণী রূপ নিয়ে: [৯৫]

শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ মুস্তফা নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। একটি নিস্পাপ প্রাণ অকালে হারিয়ে গেছে এই বাস্তবতাকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। অন্তর্দহনে সে তিলে তিলে দগ্ধ হয়।

এ পর্যায়ে মুহাম্মদ মুস্তফা তসলিমের চিঠি পায়। সে লিখেছে আশরাফ হোসেন তাঁর মেয়ের বিয়ের দিনটি এবার পীরের পরামর্শ অনুযায়ী ঠিক করবেন। কারণ পর পর দুইবার বিয়ের নির্ধারিত দিন পিছিয়ে গিয়েছে বলে মানুষ অনেক কথা বলতে পারে। চিঠির এই সমস্ত ভাষ্য মুহাম্মদ মুস্তফার হৃদয়কে বিন্দুমাত্র আলোড়িত করেনি। তাই সে চিঠির কোন উত্তরও দেয় নি। অনেক চিন্তা ভাবনার অবসান ঘটিয়ে সে ঢাকা যাওয়ার পরিবর্তে সোজা দেশের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছে। পরদিন সকালে মুহাম্মদ মুস্তফার মা আমেনা খাতুনের মর্মান্তিক আর্তনাদের মধ্য দিয়ে মুহাম্মদ মুস্তফার আত্মহত্যার কথা সবাই জানতে পেরেছে।

> "যে তেঁতুলগাছের তলে বাল্যবয়সে একটি অদৃশ্য সীমারেখা পেরিয়ে গিয়েছিলো সে-গাছ থেকে মুহাম্মদ মুস্তফার নিস্প্রাণ দেহ ঝুলছে, চোখ খোলা। সে-চোখ শ্যাওলা-আবৃত ডোবার মত ক্ষুদ্র পুকুরে কী যেন সন্ধান করছে।"[৯৬]

মুহম্মদ মুস্তফার পিতা খাদেমতুল্লা জীবনের বহু প্রতিকুলতা মোকাবেলা করে হয়ে উঠেছিল বদমেজাজি, দুশ্চিন্তগ্রস্ত এবং স্বৈরাচারী মনোভাবাপন্ন। তাই মুহাম্মদ মুস্তফা পিতৃস্নেহের আবেগ, সহানুভূতিতে বড় হয়ে ওঠেনি। সামন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে সে বেড়ে উঠেছে। তাই সে আত্মবিশ্বাসী হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

উঠতে পারেনি। তার অস্তিত্ব সংকটের বিভিন্ন পর্যায়ের বর্ণনা দিয়েছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সত্যসন্ধানী শিল্পীর মত।

মুহাম্মদ মুস্তফার কাহিনী তার পরিবারে মধ্যে সীমাবদ্ধ কিন্তু কুমুরডাঙ্গার ব্যাপক জনগোষ্ঠীর উপাখ্যান অনেক বিস্তৃত। বাকাল নদীতে চর পড়ার পর যখন স্টীমার চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, তখন থেকে কুমুরডাঙ্গার মানুষের মধ্যে একধরণের ভীতিকর হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। স্টীমার চলাচল বন্ধ মানেই মানুষের বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ বন্ধ। কুমুরডাঙ্গা সর্বস্তরের মানুষের হৃদয় যেন ক্ষয়িষ্ণুতার প্রতিভূ। এই উপন্যাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র রয়েছে। তিনি মেয়েদের মাইনর স্কুলের শিক্ষিকা সকিনা খাতুন। তার সম্পর্কে মানুষের কৌতুহলের শেষ নেই কারণ সেই একমাত্র নারী যে কুমুরডাঙ্গায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। স্কুলের চাকরী করার পরও সে রুগ্ন মায়ের সংসারের সমস্ত কাজ নিজ দায়িত্বে পালন করে। হঠাৎ সে যেন একটি কান্নার শব্দ শুনতে পায়।

> "কোথায় একটি নারী কাঁদছে। কে কাঁদে, কোথায়ই-বা কাঁদে ? ...আওয়াজটা যেন নদীর দিক থেকে আসছে। ...যে কান্না কখনো আচমকা ঝড়ের মতো কখনো ধীরে-ধীরে বিলম্বিত বিলাপের মত শুরু হয়।"[৯৭]

সকিনা খাতুন যেন নদীর কান্নার রূপকে মূলত মানুষেরই আর্তনাদ শোনে। "মানব অস্তিত্বের বিমিশ্র (Inauthentic) ও শুদ্ধ (authentic) -উভয় রূপকেই সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত করেছেন। বহির্জগৎ বিচ্ছিন্ন কুমুরডাঙ্গার ভীতিবিহ্বল জনগোষ্ঠী এবং খোদেজার আত্মহত্যার ঘটনার সাথে নিজসম্পৃক্তি অনুভব করে মুহাম্মদ মুস্তফার অন্ধকার যাত্রাকে সমান্তরাল ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এ উপন্যাসে"[৯৮]

কুমুরডাঙ্গার মানুষের মধ্যে খতিব মিঞা, কফিল উদ্দিন, বোরহান উদ্দিন, হাবু মিঞা, রহমত মিঞা, তাহের সুলতান, রোকন উদ্দিন, মোহনচাঁদ, ছলিম মিঞা, করিমুননেছা বানু, মিহির মন্ডল, ইমাম মিঞা, কনু মিঞা ও সুরত মিঞার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। ঘাটের ষ্টেশন মাস্টার খতিব মিঞাই স্টীমার না আসার সংবাদ প্রথম কোম্পানীর সদর দপ্তর থেকে 'তার' এর সাহায্যে জানতে পারে। তার দীর্ঘ কর্মজীবনে এমন বিচলিত হওয়ার মত ঘটনার মুখোমুখি কখনো সে হয়নি। বেশিরভাগ যাত্রীরা অশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সে নোটিশ দিয়ে সবাইকে জানিয়েছে এই সংবাদটি। এই মানুষটি অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ, স্টীমার চলাচল বন্ধের খবরে তার প্রথমেই মনে পড়েছে কলা চাষীদের দুর্ভোগের কথা। সঠিক সময়ে শহরে কলা পাঠাতে না

Dhaka University Institutional Repository

পারলে সব কলা নষ্ট হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষের এই সব কষ্ট যেন খতিব মিঞাকে সদা স্পর্শ করে থাকে। কোম্পানীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে সৎভাবে দায়িত্ব পালন করেই সে নিজের জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়।

কুমুরডাঙ্গায় শিক্ষিত মানুষ কফিল উদ্দিন একজন সফল আইনজীবী। স্নেহপ্রবণ পিতা হিসেবে শহরে বাস করা মেয়েকে না দেখে সে বেশিদিন থাকতে পারে না। নদী পথেই তার যাতায়াত। তাই স্টীমার বন্ধের খবর শুনে সে উৎকণ্ঠিত হয়েছে। সর্বোপরি স্থায়ীভাবে শহরে বসবাস করার সিদ্ধান্তে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে বজরায় উঠেছে। কিন্তু কুমুরডাঙ্গা তাকে ছাড়েনি। নদীর ঘাটেই তার মৃত্যু হয়েছে।

ডাঃ বোরহান উদ্দিন মানুষের কাছে নিরীহ ভালোমানুষ হিসেবে পরিচিত। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অসুখী। কারণ তিনি জানেন এই ছোট মফস্বল শহরে ডাক্তারি করা অর্থ আজরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোন রকম টিকে থাকা। এখানকার রোগীদের অনেকেরই ওসুধ কেনার সামর্থ্য নেই, এবং অধিকাংশ রোগীই রোগকে অবহেলা করে ঠিক মত তার কাছে আসে না। তাই স্টীমার বন্ধ হওয়ার ঘটনা তার মনকে তেমন একটা আলোড়িত করেনি। ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির বিষয় যুক্ত না থাকায় তার অনুভূতির কোন রূপান্তর ঘটে না। স্টীমার বন্ধের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাবু মিঞা। সে তার মৃত প্রায় বার বছরের সন্তানকে নিয়ে শহরে যেতে পারছে না চিকিৎসার্থে। মানুষের মুখে হঠাৎ স্টীমার আসার সংবাদ শুনে সে আশান্বিত হয়ে উঠে। "হাবু মিঞার বিশ্বাস ছিল স্টীমার আসবে। কিন্তু সে আগমন যে এত আসন্ন তা সে ভাবেনি। দুপুরে বংশিধ্বনি শোনা মাত্রই হাবু মিঞা তাই 'দৌড়ে বাড়ী গিয়ে ছেলেকে বুকে তুলে নিয়ে স্টীমারঘাটে পৌঁছেছে'। কিন্তু স্টীমার আসেনি। আশাহত হাবু মিঞা অতঃপর সন্তানকে বুকে করে বাড়ী ফিরে এসেছে। বস্তুত স্টীমার চলাচল বন্ধ হলে কুমুরডাঙ্গার জনজীবনকে যে তা গভীরভাবে প্রভাবিত করবে, অধিবাসীরা যে অশেষ দুর্ভোগের মধ্যে পতিত হবে হাবু মিঞার মাধ্যমে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সে-সত্যই তুলে ধরেছেন।"[৯৯]

কফিল উদ্দিনের মৃত্যু, হাবু মিঞার অসুস্থ সন্তানকে নিয়ে শহরে যেতে বাধা, সবমিলিয়ে কুমুরডাঙ্গার মানুষের মধ্যে নতুন করে যেন কোন সচেতনতার জন্ম দিয়েছে। তাদের মনে হয়েছে সত্যিই নদীর মৃত্যু হয়েছে, তাই তারা হয়েছে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন। সাইকেল ব্যবসায়ী সলিম মিঞা পর্যন্ত সকিনার অজ্ঞাত কান্নার শব্দ শোনার পর কী ভেবে যেন সকিনার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। সকিনার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা করিমুন্নেছা বানু, তিনিও নড়েচড়ে বসেন 'কান্নার শব্দের' কথা শোনার পর। সকিনার প্রতি তাঁরও একটা সমীহভাবের জন্ম নেয়, যা একধরনের ভয় থেকে সৃষ্ট। এইভাবে সকিনা খাতুনের শোনা কান্নার শব্দটি

Dhaka University Institutional Repository

আস্তে আস্তে কুমুরডাঙ্গার সকলের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়েছে। মানুষ আত্মরক্ষার্থে কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করে। হঠাৎ একদিন দর্জিপাড়ার রহমত শেখ একটি নবজাতক বাছুরকে নিয়ে নদীতে ফেলে দেয়। তার অস্বচ্ছল সংসারে একটা পানবিড়ির দোকান রয়েছে। যে দোকান নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন। কুমুরডাঙ্গার অজানিত ভয়টি তাকেও প্রভাবিত করে।

> "লম্বা-লম্বা পা ফেলে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। ... যারা তাকে দেখতে পায় তাদের কেউ কেউ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ... সে কেন এমন ভাবে ছুটছে তা জানবার জন্যে উদ্যম কৌতূহল বোধ করলে তার পিছুধরে। কাজেই রহমত শেখ যখন নদীতীরে এসে উপস্থিত হয় ততক্ষণে ছোট-খাট একটি ভীড় জমে গিয়েছে তার চতুর্পাশে। ... প্রথমে সে ধারালো ছুরি দিয়ে বাছুটির গলা কাটে, ... চোখে-মুখে নিথর ভাব। পানিতে নেবে সে হাঁটতে থাকে; হাঁটু, কোমর তার বুক পর্যন্ত সে-পানি উঠে আসে। এবার সে বাছুরটিকে শ্লথগতি স্রোতে ছেড়ে দেয়, চতুর্দিকে নদীর পানি গাঢ় হয়ে উঠে।"[১০০]

নদীর চারপাশের মানুষের কান্না মিশে গেছে বাকাল নদীর কান্নার সাথে। রহমতকে অনুসরণ করে কুমুরডাঙ্গার মানুষ বাকাল নদীতে মূল্যবান ও মূলহীন জিনিসপত্র নিক্ষেপ করে। এর পর ধীরে ধীরে তাদের ভয় কাটে। মানুষের মনও যেন অনেক শান্ত হয়ে আসে। ষ্টেশন মাস্টার খতিব মিঞা নতুনভাবে মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার করে। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে সে কুমুরডাঙ্গাতেই থেকে যাবে সিদ্ধান্ত নেয়। কুমুরডাঙ্গার মাটি ও মানুষের প্রতি ভালবাসাই তাকে এ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে। এত ঘটনার পরেও কুমুরডাঙ্গার সার্বিক পরিবেশ খতিব মিঞাকে বেঁচে থাকার প্রেরণা যুগিয়েছে। কোন ভয় তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। কুমুরডাঙ্গার রূপকে নদীমাতৃক বাংলাদেশের মানুষের অস্তিত্বভীতিকেই যেন তুলে ধরা হয়েছে উপন্যাসে।

সংশপ্তক (১৯৬৫)

সংশপ্তক শহীদুল্লা কায়সারের অসামান্য জীবনদৃষ্টির এক চিরায়তিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত গদ্যমহাকাব্য। উপন্যাসের বিষয় বস্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধ-উত্তরকাল থেকে শুরু করে বিভাগ-উত্তরকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রায় এক যুগের বাঙালির জাতীয় জীবনের ইতিহাস যা ১৯৩৮ থেকে ১৯৫১ কাল পরিসরে ব্যপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজের প্রতিনিধি বাকুলিয়া গ্রামের মিয়াবাড়ির ফেলুমিয়া। সৈয়দ পরিবরের একই গ্রামের আরেক সামন্তবাড়ি। বাকুলিয়ার প্রান্তসীমানায় অবস্থিত।

"বাকুলিয়ার প্রবেশ পথে সৈয়দবাড়ির সদর ফটক। আর বেরুবার পথে মিঞা বাড়ীর মসজিদ। দু'টো খানদানী বাড়ী। দুই প্রহরীর মত গোটা গ্রামটিকে যেন হাতের বেষ্টনে ধরে রেখেছে।"[১০১]

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আভিজাত্যপূর্ণ সৈয়দ পরিবারের প্রায় সবাই কলকাতায় চাকরিজীবী। সেখানে অনেক ক্ষেত্রে নতুন জীবনমূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা হলেও সামন্ততান্ত্রিক বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি তারা। অন্যদিকে মিয়াবাড়ির অনেকেই কলকাতায় চাকরি করে কিন্তু ফেলুমিয়া গ্রামে থেকে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে।

"পুকুর পাড়ের গাব গাছটির নীচে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ চেয়ে থাকে ফেলুমিয়া। দৃষ্টি তার প্রসারিত দখিনের ক্ষেতে। পুকুরটির পূর্বপাড় থেকে একটা সরু রাস্তা এঁকে বেঁকে গিয়ে উঠেছে তালতলির তালবীথি ছায়াপথে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলুমিয়া ধীরে ধীরে নেমে আসে রাস্তাটায়। হাতজোড়া পেছনে কোমরের উপর কেঁচির মতো আড়াতাড়ি রেখে আনত মুখে হেঁটে চলে।

কিছুদুর এগিয়ে ফেলুমিয়া উদাস চোখে তাকায় সামনের দিকে। সেখানে একটি রূপোর সুতোর মতো চিকচিক করছে খাল। ওই খালের এপার-ওপার একদা সবটাই ছিল মিঞাদের সম্পত্তি। তালতলি, চাটখিল, সুলতানপুর এসব গ্রাম ছিল মিয়াদের'ই জমিদারীর অংশ। কিন্তু কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কেমন করে যে জমিদারীটা বেহাত হয়ে যায়, সে ইতিবৃত্ত এখনো উদ্ধার করতে পারেনি ফেলুমিয়া। শুধু শুনেছিল প্রাচীন সম্পত্তি পুনর্বার বন্দোবস্ত নেবার মতো নগদ টাকা নাকি ছিল না তাদের দুর্ভগা পূর্বপুরুষদের হাতে। ছিল না তেজারতি কারবারে নগদ অর্থের অধিকারী কোন হিন্দু বেনিয়ার সাথে প্রতিযোগিতার রৌপ্যশক্তি। তাই ত্রিপুরার মহারাজার অধীনে কয়েকটা পত্তনী আর বন্দোবস্ত নিয়েই তুষ্ট থাকতে হয়েছিল সেই অভাগা পূর্ব পুরুষদের। পরে সেই পত্তনী বন্দোবস্তগুলো একের পর এক হাত ছাড় হয়েছে।"[১০২]

বাকুলিয়ায় ফেলুমিয়া তার পরিবারের পুরনো ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে এবং পুণরায় ঐতিহ্যকে ফিরে পেতে রামদয়ালের কাছে বন্ধকী রাখা জমি পুনরুদ্ধারে ক্রমে রমজানের কূটফাঁদে সহায়সম্পত্তি হারাতে বসে।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের শুরু হয়েছিল হুরমতির অবৈধ সন্তান গর্ভে ধারন করার দায়ে বিচার সভার মধ্যদিয়ে। রমজানই ছিল সেই অপকর্মের নায়ক। বিচার সভায় গ্রামের অন্যদের মধ্যে প্রধান, মিঞাবাড়ির ফেলুমিঞা। এছাড়া রমজান, খতিব সাহেব, কারি সাহেব, তালতলি হাই স্কুলের জুনিয়র মাষ্টার সেকেন্দার, প্রান্তিক চাষী লেকু, সতুর বাপ, কসির ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিল।

> "কিন্তু হুরমতি কি সমাজের এই বিচার মানে ? "নিঃশঙ্ক ঔদ্ধত্বে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। যেমনটি প্রথমেই এসে দাঁড়িয়েছিল। ওসব হুমকি ধমক বুঝি বহু শোনা আছে তার, পরোয়া করে না সে। ... পুষ্ট অথচ ধারালো দেহের ওই বঙ্কিম ভঙ্গিটিই যে বিদ্রোহের প্রকাশ্য ঘোষনা। থোড়ায় পরোয়া করে সে এই পঞ্চায়তের।"[১০৩]

তবুও বিচার শেষে ফেলুমিঞার নির্দেশে, রমজান হুরমতির কপালে তামার পয়সা আগুনে তাতিয়ে ছেঁকা দেয়। যদিও লেকু ও সেকেন্দার মাস্টার এর জন্য দায়ী ব্যক্তির শাস্তি দাবি করে। কিন্তু রমজানের কোন শাস্তি হয় না। লেকুর মত গরিব মানুষ মজলিসে তাকে অপমান করে এটা সে মেনে নিতে পারে না। জ্ঞাতি ভাই সেকেন্দারকেও সে অপছন্দ করে। সেই রমজান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কালোবাজারি, সুদের কারবার করে, এবং মিলিটারীদের ছাউনিতে কিষান যুবতীদের পৌঁছে দিয়ে রাতারাতি কালো টাকার মালিক হয়ে যায়। গ্রামের নিম্নবর্গ চাষীদের ওপরও রমজানের নির্দেশে ফেলুমিয়া নির্যাতন চালায়। এ অবস্থায় লেকু বাকুলিয়া থেকে গেলেও কসি গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়। এক রাতে হুরমতি রমজানের এক কান কেটে নিয়ে অপমানের চরম প্রতিশোধ নেয়। অসুখে মারা যায় হুরমতির পিতৃ পরিচয়হীন ছেলেটা। লোকচক্ষুর আড়ালে মুন্সীজীর সন্তান মালুকে নিয়ে সৈয়দ বাড়ির দুই কিশোরী রাবু ও আরিফা হুরমতিকে দেখতে যায়। হুরমতির কপালে পঞ্চম জর্জের প্রতিকৃতি কেমন ঘা বানিয়েছে তা দেখে তারা বিস্মিত ও ব্যথিত হয়। রাবু ও আরিফার স্নেহস্পর্শে হুরমতি কেঁদে ওঠে। মালু রানুর দাদা অশোকের কাছে গান শিখেছে এবং অসাম্প্রাদয়িক চেতনায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। এক সময় রকীব সাহেবের সহযোগিতায় রেডিওতে পল্লীগীতির প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হয়ে ওঠে এবং রিহানার সাথে বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় সে। উপন্যাসে সেকেন্দার মাস্টারকে মুক্তিকামী মানুষের সেবক হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রগতিশীল চিন্তাধারার বাহক শহীদুল্লা কায়সার সেকেন্দার মাস্টারের চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন আলোকিত দৃষ্টিভঙ্গিতে। উপন্যাসের শেষেও তাই তাকে দেখি রাবুর স্কুলের শিক্ষকতায় মানুষের চেতনা গড়ার কারিগর রূপে। শিক্ষাই হবে পশ্চাৎপদতা ও ধর্মীয় কুসংস্কারের হাত থেকে জাতিকে মুক্ত করার একমাত্র অবলম্বন। এই দীক্ষাতে সামাজিক অন্ধকার দূর করতে গ্রামের জনসমষ্টিকে শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা সে উপলব্ধি করে সর্বাগ্রে।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ পরিবারের ছেলে জাহেদ কলকাতায় পড়াশোনা শেষে বাকুলিয়ায় এসে রাজনৈতিক সংগঠন করে। দ্বিজাতি-তত্ত্বের ধারণায় বিশ্বাসী জাহেদ মুসলিম লীগের সমর্থক হিসেবে মুসলমানদের স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। সৈয়দ পরিবারের সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি জাহেদের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে। তাকে সাহায্য করে শিক্ষিতা চাচাত বোন রাবু। রাজনীতি করার কারণে জাহেদের নামে হুলিয়া জারি হয়। পুলিশ গ্রেফতার করে তাকে। রাবু প্রৌঢ় বুজর্গের সাথে বিয়েকে ভাগ্য বলে মেনে নিলেও জাহেদের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে কলকাতা এসে লেখা পড়া শিখে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হয়ে ওঠে। হুরমতি ছিল অশিক্ষিত কিন্তু রাবু তার শিক্ষা দিয়ে আত্মজাগরণে প্রতিবাদ মুখর হয়েছে। মানবীয় গুণে অন্ধ অনুশাসনকে উপেক্ষা করার বিচারবুদ্ধি তার আছে। জাহেদকে সে ভালবাসে নীতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে নয়। 'দুঃখজয়ী মানুষই জীবন জয়ী' সেকেন্দার মাস্টারের এই দার্শনিক উক্তিই যেন সত্যি হয়ে উঠেছে সমগ্র উপন্যাসের মধ্যদিয়ে। গ্রামের প্রান্তিক কৃষক লেকু-কসিরেরা ফেলু মিঞার বকেয়া খাজনা মেটাতে সর্বস্বান্ত হয়। কসির ফিরে আসার অঙ্গিকার করে দেশ ছেড়ে চলে যায়। লেকু সংগ্রামী এবং প্রতিবাদী, জীবনকে দাঁড় করাতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। লেকুর স্ত্রী আম্বরি মাটির মতই চির সহনশীলা রমণী। অর্থনৈতিক সংকটই তাদের বাগাড়ম্বর-ক্ষোভ-চিৎকারের মূল কারণ। অতি স্বল্প পরিসরে হলেও শচীনবাবু, রামদয়াল এবং রকীব সাহেব উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করেছে। রমজান তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য যেকোন কাজ করতে পারে। সে একটি সুযোগসন্ধানী চরিত্র হিসেবেই প্রতীয়মান হয়েছে। নীতি বা আদর্শের কোন ধার সে ধারে না। সমসাময়িক জীবনযাত্রায় অশুভ শক্তির মতই সমাজে তার অবস্থান। উপন্যাসে তার উপস্থিতি অত্যন্ত জীবন্ত কিন্তু সেই অর্থে সে পূর্ণাঙ্গ মানুষ নয়।

"সংশপ্তক উপন্যাস মহাভারতের বীর সংশপ্তক সেনাদের কাহিনী নয়, পূর্ববাংলার নীচুতলার যেসব মানুষ মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে লড়ে তাদেরই কাহিনী। পুরুষ-শাসিত, মোল্লা- শাসিত সমাজে শত অত্যাচারেও হার মানে না যেসব নারী, তাদেরই প্রতিনিধি হুরমতি। তার কপালে আগুনে তাতানো লাল পয়সা দিয়ে ছেঁকা দেবার যে বর্বর নিষ্ঠুর দৃশ্যটিতে উপন্যাসের সূচনা, সেখানেই নারীত্বের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে নারীর বিদ্রোহের ইঙ্গিত আছে। গ্রাম-সমাজে ফেলু মিঞাই আসল বিচারকর্তা ও শাস্তিদাতা। এই সব ফেলু মিঞার বিরুদ্ধে লেখকের শাণিত অভিযোগ এখানে উচ্চারিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মিলিটারির দাপট, গ্রাম থেকে রাতারাতি মন্বন্তর, যুদ্ধ বিপর্যস্ত মানুষের কলকাতায় যাত্রা, আজাদীর দশ বছর পরে কলকাতা থেকে ফের গ্রামে ফিরে

Dhaka University Institutional Repository

আসে হুরমতি, লেকু, ফজর আলী, মালু, জাহেদ, রাবু।"[১০৪] এভাবেই শহীদুল্লা কায়সার *সংশপ্তকে* মানুষের নিরন্তর মুক্তিসংগ্রামের যে ছবি এঁকেছেন, সেখানে মনুষ্যত্বের মুক্তি আকাঙ্ক্ষাই মূলত প্রাধান্য লাভ করেছে। উপন্যাসের শেষে পুলিশ কর্তৃক জাহেদের গ্রেফতার হওয়া, জাহেদের প্রতীক্ষায় রাবুর প্রত্যাশা সজল মূর্তি এবং সেকান্দর মাষ্টারের আশাবাদ এক সদর্থক চেতনায় উদ্দীপ্ত। তারা যেন কিছুতেই হার মানবে না। শহীদুল্লা কায়সারের ইতিহাস চেতনা ও সংগ্রামী জীবনবোধ এভাবেই উপন্যাসটিকে সবিশেষ ব্যঞ্জনায় তরঙ্গিত করে তুলেছে। গ্রামের অতি সাধারণ মানুষের সামন্তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে উত্তরণের সংগ্রামী প্রয়াস উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মূল চেতনাকে প্রগতিশীল মানবতায় প্রতিভাত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক, রূপকাশ্রায়ী ও অন্যান্য বিষয়ক উপন্যাস

ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬৩)

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে যখন স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের সুযোগ ছিল না, তখন রাজনীতি সচেতন কথাশিল্পী শওকত ওসমান রচনা করেন তাঁর সাহসী উপন্যাস *ক্রীতদাসের হাসি* । তাঁর রক্তে ছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন। তাই রূপকের আশ্রয়ে আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর আদলে অসম্ভব শিল্প দক্ষতায় প্রায় দুই হাজার রাতের কাহিনী বর্ণনা করে বাংলাদেশের পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সরাসরি বর্ণনা রীতির বাইরে গিয়ে রূপক ও প্রতীকের ব্যবহারে উপন্যাসটিকে ক্লাসিক মর্যাদায় উপস্থাপন করেছেন । পাকিস্তান আমলে রচিত অন্যান্য রূপকাশ্রয়ী উপন্যাসের মধ্যে *ক্রীতদাসের হাসি* তাই এক অনন্য সৃষ্টি। কারণ বাংলা সাহিত্যে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে যেসব রচনা রয়েছে *ক্রীতদাসের হাসি* তার মধ্যে অদ্বিতীয়। সাহিত্যে রূপকাশ্রয়ী শিল্পের ইতিহাস নতুন না হলেও এ পর্যায়ে শওকত ওসমান উপন্যাসটিকে যে অনিবার্য মুন্সিয়ানায় উপস্থাপন করেছেন তার মধ্য দিয়েই একটি সার্থক সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্ম হিসেবে সমাজজীবনের গভীরতাকে তুলে ধরেছেন।

আইয়ুবী শাসন বিরোধী গণতন্ত্রমনা অধিকার সচেতন মানুষের মানবিক চাহিদাগুলিই এ উপন্যাসের বিষয় ভাবনা হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে । "*ক্রীতদাসের হাসি* উপন্যাসে শওকত ওসমান পাকিস্তান এবং একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরশাসন-শৃঙ্খলিত সমাজ মানসের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে শিল্পরূপ দান করেছেন। সমষ্টির দর্পণে তিনি ব্যক্তির জীবনান্বেষাকে অভিব্যক্ত করেছেন। ... মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার রূপক,সমাজ চৈতন্যের প্রতিবাদের প্রতীক তাতারী, বাগদাদ নগরী ধর্মাদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের রূপক হিসেবে বিন্যস্ত হয়েছে এ উপন্যাসে।"[১০৫]

ক্রীতদাসের হাসি উপন্যাসে রূপকের মাধ্যমে ইতিবাচক জীবনসত্যকে তিনি রূপায়িত করেছেন তৎকালীন রাজনৈতিক সমাজ বাস্তবতায়। রূপক, প্রতীক, স্যাটায়ার এই সব উপাদানকে নিপুণ ভাবে সাহিত্যরূপে উপস্থাপন করে শওকত ওসমান খলিফা হারুনুর রশীদের মধ্যদিয়ে আইয়ুব খানকেই যেন মূর্ত করে তুলেছেন। আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী মনোভাবের নিকৃষ্ট ঘৃণ্য চেহারার ছবিটিই যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে

Dhaka University Institutional Repository

উঠেছে উপন্যাসে। অমানবিক প্রভুত্বকে স্বাধীনতাকামী আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির জনগণ কখনো সহজ ভাবে গ্রহণ করে না। এক সময় মানবিক অধিকার বঞ্চিত এই সব মানুষ প্রতিবাদ করে স্বৈরশাসকের ভীত নাড়িয়ে দিতে পারে। তারই সফল প্রমাণ যেন *ক্রীতদাসের হাসি*। শওকত ওসামনের তাতারী চরিত্রটি সেই বিদ্রোহী সত্তার প্রতীক হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে মুক্তিকামী মানুষের । পরাধীন বাঙলি জাতির স্বাধীনতার স্বপ্নকথা পল্লবিত হয়েছে হাজার বছর আগের বাগদাদের খলিফা হারুনুর রশিদ শাসিত ক্রীতদাসের স্বপ্নের মাধ্যমে।

উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায়, বাগদাদের খলিফা হারুনুর রশীদের বেগম জুবায়দার সাথে তার বাদী মেহেরজানের আলাপচারিতা। প্রথম থেকেই খলিফার অত্যাচারী চরিত্র তাদের কথাবার্তায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার ক্রীতদাস তাতারীর সাথে মেহেরজানের ভালবাসা রাজ্যে নিষিদ্ধ । কিন্তু বেগম জুবায়েদা মেহেরজানকে স্নেহ করেন, তাই শত নিষেধের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে মেহেরজানকে তাতরীর কাছে অভিসারে পাঠাতে সাহস করেন। মহলের একাকিত্ব যেন বেগমকে গ্রাস করতে চায়–

> ... "তুই আছিস, তাই এই প্রাসাদে আমার আনন্দ আছে। নচেৎ এই বিরাট মহলে কে কার ?
>
> বেগম, বাদী ত শত শত। কিন্তু কাছের মানুষ চেনা দায়।"[১০৬]

এই উক্তির মাধ্যমে অন্দরমহলে বেগমের অনেক কিছুর মধ্যে একা অসহায় মনে হওয়ার চিত্রটি ধরা পড়ে। অন্যদিকে দেখা যায় বিশাল সাম্রাজ্য থাকা সত্ত্বেও নিষ্ঠুর অত্যাচারী খলিফার মনের শান্তিও যেন নষ্ট হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তার বিশ্বস্ত সহচর জল্লাদ মাশরুরের পরামর্শে গভীর রাতে উদ্যানে হাওয়া খেতে গিয়ে আবিষ্কার করেন অপূর্ব সুন্দর হাসির শব্দ। খলিফা তার বুদ্ধিমান জল্লাদকে জিজ্ঞসা করলেন -

> "... আমার মহলের গায়ে কে হাসছে এত রাত্রে -এই হাসি- একটু চুপ করো। ... এ হাসি ঠোঁট থেকে উৎসারিত হয় না। এর উৎস মুখ-ডগমগ হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ। ... আমি বাগদাদ অধিশ্বর্ সুখ-ভিক্ষুক । সে ত আমার তুলনায় বাগদাদের ভিক্ষুক. তবু সুখের অধীশ্বর। কে, সে? ... মাশরুর।
>
> গোলামের হাসি জাহাপনা।
>
> ... গোলামেরা এমন হাসি হাসতে পারে?
>
> মাশরুর। পারে আমিরুল মুমেনীন। ওরা সুখ পায় না, কিন্তু সুখের মর্ম বোঝে। মনুষ্যত্বহীন, কিন্তু মনুষ্যত্বের আস্বাদ পায়। ওরা হাসে।"[১০৭]

Dhaka University Institutional Repository

খলিফা যেন মুহূর্তেই চমৎকৃত হয়ে গেলেন, তাঁর মনে হল দীর্ঘদিন ধরে তিনি যেন এই রকম একটা হাসির প্রতীক্ষায় ছিলেন। স্বৈরাচারী খলিফা ভাবলেন এই রাজ্যের সবকিছুই তার কুক্ষিগত । তবে কেন হাসি নয়? তিনি হাসি কেনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন হাসির উৎসস্থলের দিকে। এ অবস্থায় ধরা পড়ে যায়, তাতারী ও মেহেরজান। খলিফা তাতারীকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে দাসত্ব থেকে মুক্তি তো দিলেনই উপরন্তু তাতারী একটি বাগিচা সহ দাসদাসী ও প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হয়ে গেল। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বুদ্ধিমান ক্রীতদাস তাতারীই এই গল্পের নায়ক। তার মুখ দিয়ে প্রতীকী সংলাপের মাধ্যমে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন লেখকের শিল্পদৃষ্টির অমূল্য দলিল। তাতারীর মনোরঞ্জনের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত দাসী বুসায়নার সাথে কথোপকথনে এই প্রসঙ্গটি যেন আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

> "তোমার দেহের দিকে তাকাও। ও ত সওদাগরের দোকান, লেবাস আর জেওরে (অলঙ্কার) ঠাসা। দীরহাম দিলেই পাওয়া যায়। নারীর মূল্য অত সস্তা নয়- যে নারী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব জাতির শিশুকে পৃথিবীতে আমন্ত্রণ দিয়ে আনে -সে নারী শাশ্বত মানবতার জননী-বসুন্ধরার অনন্ত অঙ্গিকার, সে অত সস্তা হয় না, বুসায়না। তুমি ভুল ঠিকানায় এসেছ। যারা তোমাকে পাঠিয়েছে তারাও পৃথিবীর ঠিকানা যানে না ... প্রতিদিন কিছু দীরহাম ছুঁড়ে ফেলে, যারা তোমাকে বেইজ্জৎ করে আমি তাদের মত তোমাদের অসম্মান করতে শিখিনি । আমি গোলাম। দীরহাম দিয়ে সব কিছু কেনার পাগলামি থেকে অন্তত আল্লা আমাকে রেহাই দিয়েছেন।"[১০৮]

এক পর্যায়ে মেহেরজানকে বেগম হিসেবে তাতারী গ্রহণ করে। সবই এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু বুদ্ধিমান তাতারী ভেতর থেকে তার এই জৌলুস মেনে নিতে পারে না। অবলীলাক্রমে তার হাসি স্তব্ধ হয়ে যায়। খলিফা তাতারীর এই পরিবর্তিত অবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়। তাই ক্রীতদাসের প্রাণোচ্ছল হাসির শব্দ শোনার জন্য প্রথমে তাকে খুশি করার পথ বেছে নিয়ে যখন ব্যর্থ হয় তখন নির্যাতন করা শুরু করে। তাতারী খলিফাকে বুঝিয়ে দিল সে জাগতিক ঐশ্বর্য দিয়ে সবকিছু কেনা গেলেও প্রাণের আনন্দ থেকে উৎসারিত অপার্থিব হাসি কেনা অসম্ভব। এই হাসির উৎসস্থল ধনসম্পদ নয়, একান্তই প্রাণের আবেগ উৎসারিত। তাই মৃত্যুর আগে তাতরীর সাহসী উচ্চারণ-

> "শোন, হারুনুর রশীদ । দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে। বাদী কেনা সম্ভব । কিন্তু-কিন্তু- ক্রীতদাসের হাসি- না-না-না-না- ।"[১০৯]

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের শেষাংশে কবি নওয়াস খলিফাকে উদ্দেশ্য করে এই জীবনসত্য উচ্চারণ করে যে "... হাসি মানুষের আত্মারই প্রতিধ্বনি"। জীবনবোধে এখানে একজন ক্রীতদাসের সাথে একজন কবির সাদৃশ্যের সমন্বয় এভাবেই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।

ক্রীতদাসের হাসি উপন্যাসটিকে আশ্রয় করে এভাবেই শওকত ওসমান পাকিস্তানি সামরিক জান্তার একনায়কতন্ত্রের ফলে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যার রূপ অঙ্কন করেছেন। "অত্যাচারী খলিফার শাসনাধীন বাগদাদকে এই কাহিনীতে অভিশপ্ত নগর হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। সারা পাকিস্তানই তখন স্বৈরশাসনের নিষ্পেষণে অভিশপ্ত। উপন্যাসে বাগদাদ নগরী যেন সমগ্র পাকিস্তানের রূপক হিসেবে ব্যবহৃত।"[১১০]

এই উপন্যাসের অন্তর্নিহিত গভীর চিন্তশীল দর্শনই উপন্যাটিকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে। উপন্যাসের মূল দ্বন্দ্ব খলিফা হারুনুর রশীদের মানসিক অশান্তির বিপরীতে ক্রীতদাস তাতারীর সাথে তার প্রেমিকা, দাসী মেহেরজানের প্রাণখোলা হাসির সঙ্গে সম্পর্কিত। একদিকে পার্থিব ঐশ্বর্য অন্য দিকে অপার্থিব হাসির সৌন্দর্য, এই দুইয়ের অসম দ্বন্দ্বে উপন্যাসটি ক্রমেই পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। প্রতীকাশ্রয়ী চরিত্র গুলি মূলত একটি চেতনার প্রতীক হিসেবে রূপায়িত হয়েছে। সাংকেতিক বক্তব্য এবং গল্পরসের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত এই কাহিনী তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সত্যিই এক সাহসী পদক্ষেপ। রাজনৈতিক ঘটনাবলী জনজীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে তার উপযুক্ত উপমা বলা যায় *ক্রীতদাসের হাসি*। "উপন্যাসের ঘটনাংশ থেকে একটা সরল দার্শনিক মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়। যে মীমাংসাটি হলো-ক্ষমতা, অর্থ এবং শক্তিবলে মানুষের চিত্তলোক অধিকার করা যায় না। ... বক্তব্যের গভীরতর ব্যঞ্জনাই *ক্রীতদাসের হাসি* উপন্যাসকে কালোত্তর মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছে।"[১১১]

জীবনঘনিষ্ট কাহিনীর মধ্য দিয়ে শওকত ওসমান রাজনৈতিক বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেছেন অত্যন্ত সচেতনভাবে। একনায়কতন্ত্র পীড়িত বাংলাদেশে মুক্তিকামী মানুষের জীবনাকাঙ্ক্ষা তাদের উচ্চারিত সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বাগদাদকে পাকিস্তানের রূপকে উপস্থাপনের মাধ্যমে তৎকালীন বাংলাদেশের জনজীবনে যে চির অন্ধকার নেমে এসেছিল, তা বক্তব্যের গভীরতায় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন শওকত ওসমান ।

Dhaka University Institutional Repository

আরেক ফাল্গুন (১৯৬৯)

রাজনীতি ও সমাজ সচেতন উপন্যাস হিসাবে ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত *আরেক ফাল্গুন* বাংলা কথাসাহিত্যে জহির রায়হানের এক অনন্য সংযোজন। রাজনৈতিক বৈষম্যের এক নিগূঢ় সত্য যেন উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। ১৮৫৭ সালের ঐতিহাসিক বাস্তবতা দিয়ে এই উপন্যাসের শুরু। জীবনের খণ্ড খণ্ড মূহূর্তের মধ্য দিয়ে মানুষের মুক্তির চেতনাকে জহির রায়হান জীবন্ত করে তুলেছেন। এই উপন্যাস সম্পর্কে রনেশ দাশ গুপ্তের মূল্যবান মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে "*আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের একটি বিশিষ্ট রীতিকে সামনে এনেছেন জহির রায়হান। এই রীতিটি শহীদের প্রতি সম্মানে নগ্নপদের মিছিল। ব্যাপক বৈপ্লবিক সংগ্রামী ও গণঐক্যের শপথের প্রকাশ এ রীতিটি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সংগ্রামী ও বৈপ্লবিক গণসমাবেশের একটা অবিভাজ্য পদ্ধতি রূপে কাজ করেছে।"[১১২]

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের শুরু হলেও শেষ হয়েছে ২১শের চেতনাকে সমুজ্জল রাখার প্রত্যয় দিয়ে। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন যেমন ১৮৫৭ সাল থেকে শুরু হয়, ঠিক যেন তেমন ভাবে বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনও শুরু হয় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই উপন্যাস যখন প্রকাশিত হয় তখন জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলনে বাংলাদেশের মানুষ সদা উন্মুখ। সঙ্গত কারণেই উপন্যাসে এসেছে সূক্ষ্ম শ্রেণী চেতনা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার এক সংগ্রামী সংমিশ্রণ । ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উপন্যাসের মূল চরিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে সচেতন ভাবে। আসাদ, সালমা, ডলি, মুনিম, রসুল প্রভৃতি চরিত্রগুলির মাধ্যমে জহির রায়হান সমাজবোধের গভীরতাকে তুলে ধরেছেন। যদিও উপন্যাসটি বক্তব্য প্রধান, চরিত্র প্রধান নয় সঙ্গত কারণেই ছাত্র-ছাত্রীদের সংগ্রামী মনোবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের যৌবনের উচ্ছ্বলতাকে কেন্দ্র করে প্রেমের বিকাশও দেখা যায়। কিন্তু এই প্রেম শুধু মাত্র আবেগসর্বস্ব নয়। নির্দিষ্ট আদর্শের সংগ্রামী জীবনাচরণের মধ্যে দিয়েই তার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে।

প্রেম ও সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম মুনিম। তার চরিত্রই উপন্যাসে সর্বাধিক উজ্জ্বল। পিতা মাতার একমাত্র সন্তান মুনিম মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতিতে সে প্রতিনিধি স্থানীয় ছাত্রনেতা। রাজনৈতিক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি বিষয় মুনিম নিজ দায়িত্বে পালন করে। তার ব্যক্তিচেতনা অণুসরণযোগ্য। প্রেমিকা ডলির জন্মদিনের উৎসবে নগ্ন পদে হাজির হলে ডলি খুশি হতে পারে না। মুনিম তাকে জানায় একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে শহীদদের প্রতি সম্মান জানাতে তিন দিন তারা

Dhaka University Institutional Repository

নগ্ন পায়ে চলার নীতি গ্রহণ করেছে। আদর্শ পালনে মুনিমের দৃঢ়তাকে ডলি তার প্রতি উপেক্ষা ভেবে নিয়েছে। তাই জন্মদিনের অণুষ্ঠানে ঘরে না গিয়েও মুনিম ফিরে আসে। ডলি রাজনীতি পছন্দ করলেও রাজনীতির পেছনে মুনিমের বেশি সময় দেয়াকে নিজের প্রতি অবহেলা মনে করে। আদর্শের কারণে ডলির আচরণে মুনিমের দৃঢ়তা প্রকাশ পেলেও তার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ কম হয়নি। খাবার টেবিলে দেশের বর্তমান অবস্থায় স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে মুনিম সচেতন। জাহানারার স্বামী অধ্যাপক সাহেবের সাথে মুনীমের কথোপকথনে সেই কথার প্রতিধ্বনিই যেন উচ্চারিত হয়েছে।

> "তোমাদের ওই নেতাদের ওপর আমার এতটুকু আস্থা নেই। আমি জানি এবং বেশ ভালো করে জানি, ওদের মধ্যে কোন পৌরুষ নেই। কতগুলো ভীরু কাপুরুষ ওরা। তোমার কি মনে হয় ওরা এ সমাজে তোমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে?
>
> মুনিম এবারও নিরুত্তর রইলো। নেতাদের সে নিজেও যে খুব বিশ্বাসের চোখে দেখে তা নয়। আর বিশ্বাস করবেই বা কেমন করে ? নেতাদের কাছে দল বেঁধে দেখা করতে গিয়েছিল ওরা, ওদের সক্রিয় সাহায্য চেয়েছিল, ওরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেছে। বিব্রত গলায় বলেছে, দেখো সাংঘাতিক কিছু করে বোসো না তোমরা । দেখো যেন শান্তি ভঙ্গ না হয়।
>
> শান্তি বলতে কি মনে করে ওরা।
>
> অন্যায়ের কাছে মাথা নত করা? 'আক্রমনের মুখে আত্মসমর্পন?
>
> আমি জানি, তোমাদের ওই নেতারা কি চায়। ... ওদের আশু লক্ষ্য হলো গদী দখল করা। আর পরবর্তী অভিপ্রায় হলো বাকী জীবনটা যাতে স্বচ্ছন্দে কাটে সে জন্যে মোটা অঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করা। তুমি কি মনে করেছো ওরা দেশকে ভালবাসে ? দেশবাসীর জন্যে দরদে বুক ওদের ফেটে চৌচির হয়ে যায়, তাই না ? "[১১৩]

জাহানারার অধ্যাপক স্বামীর উচ্চারিত কথাগুলি আজ ৪০ বছর পরও যেন সত্যি বলেই মনে হয়। যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীরাই ভরসা, নেতারা সুবিধাবাদী। ১৯৫২ তে ২১ ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে নেতারা দ্বিধান্বিত থাকলেও ছাত্রছাত্রীরাই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল।

যে সব ছাত্র-ছাত্রী ১৯৫২ সালের মহান ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল তাদের সবাই কে ১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির তিনদিন আগে ধরে আনা হয়েছিল লালবাগ থানায়, ছাত্রছাত্রীরা কালো ব্যাজে, কালো পতাকা নিয়ে, নগ্নপায়ে হাজির হবে শহীদ মিনারে। কেউ কেউ তিনদিন আগেই রোজ ভোরে খালি পায়ে ২১শে উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি শুরু করেছে। ঢাকা শহরের সব শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা একত্রিত হয়েছে। তারা মানসিক ভাবে প্রস্তুত। সালমা এসেছে মেডিকেল কলেজ থেকে সেখানে তার সাথে পরিচয় হয় ইডেন ও করিমুন্নেসা কলেজের ছাত্রী রেণু ও নীলার। ১৯৫০ সালে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে গুলিতে সালামার স্বামী রওশন দুই হাতই হারায়। বর্তমানে সালমার স্বামী, ভাই এবং ছোট বোন জেলে। ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শহীদ দিবসের কর্মসূচীতে সে অংশগ্রহণ করে সক্রিয়ভাবে ; শোষকের জেলখানাকে সে ভয় পায় না। আসাদও সালমার মতই বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের চেতনায় উদ্দীপ্ত এক তরুণ ছাত্র। কবি রাসুলও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দেশপ্রেমিক ছাত্র। অসুস্থ শরীরে তরুণদেরকে একুশে ফেব্রুয়ারির গল্প শুনিয়ে অনুপ্রাণিত করে। ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে ছাত্রছাত্রীরা একইসঙ্গে শ্লোগান দেয়, শহীদের খুন ভুলব না... বরকতের খুন ভুলব না। কেঁপে ওঠে ঢাকা। পাকিস্তানি পুলিশ সচকিত হয়ে অস্ত্র তাক করে। মায়েদের মন শংকিত হয়- আবারও কি বায়ান্নোর মতো রাজপথ রক্তে ভেসে যাবে ? খালি হবে কোন মায়ের বুক?

একমাত্র জহির রায়হানের *আরেক ফাল্গুন* এ পাকিস্তান বিরোধী গণপ্রতিরোধ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা যেন জনজোয়ারের মতো একত্রিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আসাদ, মুনীর, সালাম, নীলা, কবি রসুল, রেণু ও রোকেয়া প্রমুখ ছাত্রছাত্রীর নেতৃত্বে সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শ্লোগান দিয়ে রাস্তায় নেমেছে। পুলিশের প্রতিরোধে ওরা রক্তাক্ত হয়েছে। গ্রেফতার হয়ে লালবাগ থানা ক্যাম্পাসে আশ্রয় নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেই লালবাগ থানায় ডলি ছুটে এসেছে মুনিমকে ফুল দিতে। ডলির মূল্যবোধের প্রকাশ এর চেয়ে আর কী হতে পারে? ডলিকে দেখে মুনিমের হৃদয়ে নতুন আশার সঞ্চার হয়। ঔপন্যাসিকের জীবন উপলব্ধি সমাজের মানুষের মধ্যে রূপান্তর লাভ করেছে। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের সময় জহির রায়হান এই উপন্যাসটি রচনা করেন। এই উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোকিত ইতিহাস যেন প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। কবি রসুলের উচ্চারিত সংলাপ যেন এ কথার সত্যকে সমর্থন করে।

> ... কবি রসুল চিৎকার করে উঠলো জেলখানা আরোও বাড়ান। এত ছোট জেলখানায় হবে না। আর একজন বললো এতেই ঘাবড়ে গেলেন নাকি? আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো।"[১১৪]

এই কথার মধ্য দিয়ে একুশের চেতনার ক্রমবিকাশকেই ইঙ্গিত করেছেন জহির রায়হান। রাজনীতিতে মেয়েদের সরাসরি জড়িত থাকার ঐতিহাসিক দলিলের মত কখনো মনে হয়েছে। তৎকালীন রাজনীতির প্রেক্ষাপটে মুনিম খুবই উজ্জ্বল একটা চরিত্র। সালমাও তাই। উপন্যাসের শেষে নীলার কণ্ঠে

Dhaka University Institutional Repository

'আমার সোনার বাংলা' গানটি এক অন্য দোত্যনা সৃষ্টি করে। যা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। জহির রায়হান তাঁর দূরদৃষ্টির সাহায্যে হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন এই গানটি একদিন তার প্রিয় মাতৃভূমির জাতীয় সংগীত হবে। এই দূরদর্শিতাই জহির রায়হানকে বাংলা কথাসাহিত্যের অঙ্গনে চির স্মরণীয় করে রেখেছে।

পান্নামোতি (১৯৬৪)

পান্নামোতি উপন্যাসে আমাদের দেশের অবহেলিত দাই সম্প্রদায়ের করুণ জীবনকাহিনীকে উপজীব্য করা হযেছে। **সরদার জয়েনউদ্‌দীন এই** উপন্যাস নির্মাণ করেছেন গভীর সমাজ চেতনা থেকে। আমাদের সমাজব্যবস্থায় জাতপাতের বিচার এখনও বিদ্যমান সমস্যা । জেলে, কামার, কুলু, জোলা, দাই বেহারা ইত্যাদি সমাজের সাথে লৌকিক সম্পর্ক স্থাপনে স্বাভাবিক ভাবে কেউই আন্তরিক নয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত এই দাই সমাজের কথা *পান্নামোতি* উপন্যাসের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বলভাবে উপস্থাপন করেছেন লেখক। দাই পরিবারের নারীরা সাধারণত সন্তান প্রসব করানোর কাজের সাথে সম্পৃক্ত। তাই তারা ছিল সমাজে একপ্রকার অবহেলিত। সমাজের নিম্নস্তরের বৃত্তিজীবী ধাত্রী পরিবারের কথা আছে উপন্যাসে। এর বিপরীতে আছে ক্ষয়িষ্ণু দেহলোলুপ জমিদার পরিবারের কথা।

ধাত্রী পরিবারে রুটিরুজির মালিক ছিল মেয়েরা। তারা প্রসূতিকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে নবজাতককে পৃথিবীর আলো দেখাতো। তারা ছিল স্বাধীনচেতা এবং সামাজিকভাবে তাদের ব্যক্তিগত চরিত্রকে ঘিরে লোক-গঞ্জনা যেন তাদের প্রাপ্য ছিল।

ধাত্রী অমৃতদায়িনীর সাথে জমিদার বাবুর বড়ছেলের শারীরিক এবং মানসিক সম্পর্কের সূত্র ধরেই কাহিনীর শুরু। তার পরিবারে বংশানুক্রমে জমিদার পরিবারের সাথে অনুরূপ সম্পর্ক ঐতিহ্য ও গর্বের বিষয় বলে বিবেচিত। কয়েক পুরুষ আগে জমিদার ঘনশ্যাম দেবীর আদেশে পাশের দাই বাড়ী থেকে দাও এনে বন কেটে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। তারপর কত জমিদার এলো, বর্তমানে জমিদারীর অর্থ ও দাপট এ-দু'টোই ম্লান হয়েছে। রাজাবাবু শক্তিপদ চৌধুরী ও তার ছোট ভাই ধ্রুব চৌধুরী বর্তমানে জৌলুসহীন অবস্থায় কোন রকম টিকে আছে। পুরুষাক্রমে জমিদার বাবুদের সাথে দাই বাড়ীর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, এই

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্ককে তারা দোষের মনে করে না। দাই পরিবারের মেয়েরাও তাই নিজেদের সংসার ছেড়ে কোথাও যায়নি। অমৃতের ঘর জামাই হিসেবে জমিদার পুত্র শক্তিপদের খোঁড়া পেয়াদা লালনকে সে জীবনসঙ্গী রূপে পেয়েছে। অমৃতের দুই সন্তানই বিশু এবং পান্না শক্তিপদ চৌধুরীর ঔরসজাত। তাদের চেহারার সাথেও রাজাবাবুদের চেহারার মিল রয়েছে। বিশু ও পান্না উভয়ই বড় হচ্ছে এই সত্য জেনে। রাজাবাবুদের পরিবারের আর এক জনের নজরে পড়েছে পান্না। এটা মেনে নিতে পারছে না বিশু । শক্তিপদবাবুর ছোট ভাই ধ্রুব চৌধুরী পান্নার প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করে। অমৃত এতে অন্যায়ের কিছু দেখে না। কিন্তু এই বাস্তবতা পান্না ও বিশু মেনে নিতে পারে না। গ্রামের লোকেরা তাদের জন্ম নিয়ে উপহাস করলে তারা প্রতিবাদও করে। তাদের মনোজগত জটিল এই সমাজবাস্তবতাকে প্রকৃত অর্থে ঘৃণা করে। আত্মমর্যাদার প্রশ্নে বিশু সিদ্ধান্ত নেয় তার বোনকে কোন মুসলমান পরিবারে বিয়ে দেবে, সে কোন ক্রমেই ধ্রুব চৌধুরীর ফাঁদে পা দিতে দেবে না বোনকে। তাই মায়ের অমতে দীনু শেখের সাহায্যে বিশু পান্নাকে বিয়ে দেয় মনিরদ্দির সাথে। দীনু শেখ রাজাবাবুদের বাড়ীতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে, সে সামন্তপ্রভূদের প্রাচুর্য-ঐশ্বর্য, শাসন-শোষণ থেকে শুরু করে বর্তমানে মুখ থুবড়ে পড়া বড়বাবু ও ছোটবাবুকেও ভাল করে চেনে। নিজের নিষ্ঠা থেকে কখনো বিচ্যুত হয়নি। ছোটবাবুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজাবাবু একদিন জমিদার বাড়ী থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয়। নিজের বিবেক ও মনুষ্যত্বের কাছে সে কখনো মাথা নিচু করেনি। তাই সে এসে দাঁড়ায় অসহায় এই ভাই-বোনের পাশে। যদিও কোনদিক থেকে মনিরদ্দি পান্নার উপযুক্ত পাত্র নয়, তবুও আত্মসম্মান রক্ষার্থে সারা জীবন কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচতে এ ছাড়া অন্য কোন উপায় খুঁজে পায় না তারা। কিন্তু এতেও পান্নার জীবনে শান্তি আসে না।

প্রথমত নামাজ না জানা এবং দ্বিতীয়ত পান্নার জন্ম ইতিহাস তার শ্বশুরবাড়ীর মানুষ লোকমুখে শুনে মেনে নিতে পারে না। অমানবিক অত্যাচার করে পান্নার উপর । এ অবস্থায় একদিন ধ্রুব চৌধুরী পান্নার শ্বশুর বাড়ীর গ্রামে পালা গাইতে গেলে পান্নার সাথে গোপনে দেখা করার অপরাধে শ্বাশুড়ীর কাছে নির্যাতিত এবং মনিরদ্দির হতে নিগৃহীত হয়। এ অবস্থায় ভাই ছাড়া কাউকে তার আপন মনে হয় না। রক্তাক্ত শরীরে পান্না ভাইয়ের উদ্দেশ্যে নদীর তীর ধরে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে পিছন থেকে ধ্রুব বাবুর ডাক শুনে নদীতে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করে। পান্নাকে বাঁচাতে ধ্রুববাবুও তৎক্ষনাৎ নদীতে ঝাঁপ দেয়।

> "কিন্তু ততক্ষণে আশ্বিনের ইছামতির স্রোত কোন অতলে তলিয়ে নিয়ে গেছে পান্নাকে, হয়তো সে এতক্ষণে ইছামতির স্নিগ্ধ কোলে শান্তির ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছে।"[১১৫]

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাস পাঠ শেষে পাঠকের বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে আপনা থেকেই। আর এখানেই ঔপন্যাসিকের কাহিনী বর্ণনায় চরিত্র রূপায়ণের সার্থকতা ধরা পড়ে। তৎকালীন সমাজে দাই সমাজের বাস্তব রূপটি তুলে ধরতে লেখকের যে গভীর জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যিই অতুলনীয়। নারীর আত্মসম্মানবোধ পান্নার মধ্যদিয়ে উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। পরিবারের অন্যদের কাছে যা দোষের নয়, পাপের নয় বরং গৌরবের, তা-ই পান্নার কাছে একান্ত লজ্জার ও মৃত্যুর অধিক অপমানের। বিশু ও পান্না দুই ভাই-বোন ভবিষ্যৎকে অতীতের নীতিহীন অন্যায় আচরণ ও কুসংস্কার দিয়ে ক্লেদাক্ত করতে রাজী নয়। গ্রামীণ সমাজের বাস্তবতা নির্মাণে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সরদার জয়েনউদ্‌দীন সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সে কথা এই উপন্যাসের মাধ্যমে আরেক বার প্রমাণিত হল। গ্রামের লোকভাষার সংমিশ্রণে জীবনঘনিষ্টতাই তাঁর উপন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য। পল্লীর অভাবগ্রস্থ সাধারণ মানুষের কাহিনী তাঁর বর্ণনার গুনে অসাধারণ মূল্যবোধের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামন্ত প্রভুদের কলঙ্কময় ভোগ-লালসার কাহিনী উপন্যাসে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ, রফিকউল্লাহ খান, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃ. ১১৬

২। লালসালু, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-১, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, ১৯৮৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৪

৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮

৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯০

৭। বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬০

৮। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম, জীনাত ইমতিয়াজ আলী, শিল্পতরু প্রকাশনী ১৯৯২, ঢাকা, পৃ. ৯৪

৯। লালসালু, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

১০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

১১। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম, জীনাত ইমতিয়াজ আলী, শিল্পতরু প্রকাশনী ১৯৯২, ঢাকা, পৃ. ১১০

১২। আবু ইসহাক, সূর্য-দীঘল বাড়ী, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৯

১৩। বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২

১৪। আবু ইসহাক, সূর্য-দীঘল বাড়ী. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩-১৮৪

১৫। প্রাগুক্ত. পৃ. ১৪৭

১৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

১৭। শওকত ওসমান, মুখবন্ধ, 'জননী' উপন্যাস, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১, ঢাকা বুকস, ঢাকা,

১৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২-২৪৪

Dhaka University Institutional Repository

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭-১১৮

২০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২

২১। সৈয়দ আলী আহসান, 'সতত স্বাগত', ইউনির্ভাসিটি প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৭১

২২। সরদার জয়েনউদ্‌দীন, পূর্ব পাকিস্তানের উপন্যাস (প্রবন্ধ), 'আমাদের সাহিত্য', বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ও সরদার ফজলুল করিম সম্পাদিত, কার্তিক সংখ্যা, ১৩৭৬, ঢাকা, পৃ. ১৮৬

২৩। বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

২৪। হাজার বছর ধরে, ড: আশরাফ সিদ্দিকি, জহির রায়হান রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রকাশক-বাংলা একাডেমীর পক্ষে আহমদ পাবলিশিং হাউস, জানুয়ারী ১৯৯৬, ঢাকা, পৃ. ১১১-১১২

২৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১১৬

২৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

২৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২

২৮। সারেং বৌ, শহীদুল্লা কায়সার, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৮, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, পৃ. ১৮২

২৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

৩০। প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০-২১১

৩১। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

৩২। বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

৩৩। সারেং বৌ, শহীদুল্লা কায়সার , প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪

৩৪। আলাউদ্দিন আল আজাদ, কর্ণফুলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৪, ঢাকা, মুক্তধারা, পৃ. ১৮

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৩৬। আলাউদ্দিন আল আজাদের একটি অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার, (সাক্ষাৎকার গ্রহণ: মুসাফির নজরুল) দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৪মে ২০১০, পৃ. ৯

৩৭। *কাশবনের কন্যা*, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, পরিমার্জিত জয়ন্তী সংস্করণ, ১৩৯৪, ঢাকা, মুক্তধারা, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

৩৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

৩৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

৪০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৪১। অরুন কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা (বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর: ১৯২৩-১৯৯৭), তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃ. ২৯৮

৪২। বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

৪৩। সত্যেন সেন, পদচিহ্ন, ১৩৭৫, ঢাকা, কালিকলম প্রকাশনী, পৃ. ২৪

৪৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

৪৫। সরদার জয়েনউদ্‌দীন, আদিগন্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫, ঢাকা, মুক্তধারা, পৃ. ৪১

৪৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫-১৬৬

৪৭। চাঁদের অমাবস্যা, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

৪৮। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১১৬

৪৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

৫০। বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ, প্রাগুক্ত. পৃ. ১১৯

৫১। চাঁদের অমাবস্যা, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

৫২। বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ, করুণাময় গোস্বামী সম্পাদিত, উপন্যাস, রফিকউল্লাহ খান, সুধীজন পাঠাগার, নারায়ণগঞ্জ, প্রকাশিত ১৪০০ সাল, ১মাঘ, পৃ. ১৪২

৫৩। চাঁদের অমাবস্যা, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

৫৪। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম, জীনাত ইমতিয়াজ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৫৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

৫৬। চাঁদের অমাবস্যা, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

৫৭। আবুল ফজল, জীবন পথের যাত্রী, আবুল ফজল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, আলাউদ্দিন আল আজাদ সম্পাদিত ১৯৯৪, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ. ২৫৪

Dhaka University Institutional Repository

৫৮। বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৫৯। সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল, আনোয়ার পাশা, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১ জুলাই ১৯৬৭. পৃ. ১৪২-১৪৩

৬০। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

৬১। আবুল ফজল, রাঙা প্রভাত, আবুল ফজল রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫

৬২। সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল, আনোয়ার পাশা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫-১৪৬

৬৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

৬৪। অনেক সূর্যের আশা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৪, চট্টগ্রাম, বইঘর, পৃ. ৩২৩

৬৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮

৬৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

৬৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

৬৮। ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭, সাহিত্য নিকেতন, ১১০ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম থেকে লেখা চিঠি। উদ্ধৃতি, আহমদ কবির, সরদার জয়েনউদ্‌দীন জীবনী গ্রন্থমালা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৭৫

৬৯। উত্তরণ, সত্যেন সেন, ১৯৭০, ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, পৃ. ৪৬০

৭০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬০-৪৬১

৭১। কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বেজ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯৯, পৃ. ২৯৬

৭২। বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৃষ্টি যার বহুমাত্রিক, সপ্তসিন্ধু, ডেসটিনি, ১০ জুলাই ২০০৯, পৃ. ৭

৭৩। বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

৭৪। ক্ষুধা ও আশা, আলাউদ্দিন আল আজাদ, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৭৪, ঢাকা, মুক্তধারা, পৃ, ৩৮-৩৯

৭৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

৭৬। নির্বাচিত প্রবন্ধ, জহির রায়হান : তাঁর উপন্যাস শিল্প, অনন্যা প্রকাশনী, প্রকাশকাল ২০০১,পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

৭৭। বরফ গলা নদী, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকি, জহির রায়হান রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রকাশক-বাংলা একাডেমীর পক্ষে আহমদ পাবলিশিং হাউস, জানুয়ারী ১৯৯৬, ঢাকা, পৃ. ৩৪৮

৭৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫

৭৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮

৮০। আলাউদ্দিন আল আজাদের অপ্রকাশিত স্বাক্ষাৎকার, স্বাক্ষাৎকার গ্রহণঃ মুসাফির নজরুল, নয়া দিগন্ত ১৪ মে ২০১০, পৃ. ৯

৮১। তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, আলাউদ্দিন আল আজাদ, পঞ্চম প্রকাশ ১৩৯০, ঢাকা, মুক্তধারা, পৃ. ৯০

৮২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৮৩। উত্তম পুরুষ, রশীদ করীম, ১৯৬১, ঢাকা, আনিস ব্রাদার্স, পৃ. ১

৮৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

৮৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৮৬। বাংলাদেশের উপন্যাসঃ বিষয় ও শিল্পরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫৪

৮৭। এক মহিলার ছবি, সৈয়দ শামসুল হক, ১৯৫৯, ঢাকা, সাহানা প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী বিল্ডিং, পৃ. ৯৮-৯৯

৮৮। দেয়ালের দেশ, সৈয়দ শামসুল হক, ১৯৫৯, ঢাকা, আর্ট এ্যাণ্ড লেটার্স, পৃ. ১৫১

৮৯। সীমানা ছাড়িয়ে, সৈয়দ শামসুল হক, ১৯৬৪, ঢাকা, মওলা ব্রাদার্স, পৃ. ১০৭

৯০। বাংলাদেশের উপন্যাসঃ বিষয় ও শিল্পরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫৮

৯১। শেষ বিকেলের মেয়ে, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকি, জহির রায়হান রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮

৯২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৯৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

৯৪। বাংলাদেশের উপন্যাসঃ বিষয় ও শিল্পরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৬৫

৯৫। কাঁদো নদী কাঁদো, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪

৯৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫

Dhaka University Institutional Repository

৯৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

৯৮। বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ, করুণাময় গোস্বামী সম্পাদিত, উপন্যাস, রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

৯৯। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম, জীনাত ইমতিয়াজ আলী, প্রাগুক্ত. পৃ. ১৩৪

১০০। কাঁদো নদী কাঁদো, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯

১০১। সংশপ্তক, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮২, ঢাকা, মুক্তধারা, পৃ. ৪৬

১০২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

১০৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

১০৪। কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ২৯৫-২৯৬

১০৫। বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ, করুণাময় গোস্বামী সম্পাদিত, উপন্যাস, রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

১০৬। ক্রীতদাসের হাসি, শওকত ওসমান, সপ্তম সংস্করণ ১৯৮৩, ঢাকা, মুক্তধারা, পৃ, ১৬

১০৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩

১০৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭

১০৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

১১০। সৈয়দ আজিজুল হক, 'শওকত ওসমানের রূপক উপন্যাস', সাহিত্য পত্রিকা (ম.মনিরুজ্জামান সম্পাদিত), উনত্রিংশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জুন ১৯৮৬, পৃ. ২৪৯

১১১। বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩

১১২। উপন্যাসের শিল্পরূপ, রণেশ দাশগুপ্ত, কালি-কলম প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৭৬, পৃ. ২৩০

১১৩। আরেক ফাল্গুন, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকি, জহির রায়হান রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

১১৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

১১৫। সরদার জয়েনউদ্দীন, পান্নামোতি, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৭১, ঢাকা, ওসমানিয়া বুক ডিপো, পৃ. ১৮১

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পূর্ববাংলার মানুষের সাথে রাষ্ট্রব্যবস্থার একটা সংঘাত শুরু হয়ে যায়। পূর্ববাংলার মধ্যবিত্তের সন্তানেরা ধর্ম পরিচয়ের বাইরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করা শুরু করে। সেই সময় প্রসারিত হচ্ছিল শিল্প-সাহিত্যের চর্চা। উদার মানবিক সম্প্রীতির বিশ্বচেতনা এবং সকল প্রকার কূপমণ্ডুকতার অবসান ঘটে এ সময়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মানুষের মূল্যবোধের পতন, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্মৃতি, দেশ বিভাগ জনিত মানবিক বিপর্যয়, দু'বাংলার শেকড়হীন মানুষের অসহায়তা, হতাশা, অবক্ষয় প্রভৃতি এ রকম একটি অদ্ভুত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে পূর্ববাংলার লেখকরা লিখতে শুরু করেছিলেন। অতঃপর পাকিস্তানের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশলকে নস্যাৎ করে দিয়ে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা পূর্ববাংলার মানুষের জন্য ছিল এক বিরাট অর্জন। নিজের ভাষায় সাহিত্যের মানসম্মত রূপদান আমাদের লেখকদের জন্য গৌরব বয়ে আনে।

প্রকৃতপক্ষে চল্লিশের দশকের শেষার্ধ থেকে বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছিল। বিশেষ করে পূর্ববাংলার মানুষ যখন অতিক্রম করছিল এক অভূতপূর্ব ক্রান্তিকাল। বিপুল জনগোষ্ঠীর স্বপ্ন-কল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংস্কার, মূল্যবোধ ও জীবনাচরণের সাহিত্যরূপ উপস্থাপনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন হাতে গোনা কয়েকজন তরুণ সাহিত্যকর্মী। এ পর্যায়ে কথাসাহিত্যিকগণ প্রাথমিক ভাবে দেশভাগের যন্ত্রণা, গ্রাম বাংলার নিম্নবিত্ত মানুষের সংগ্রামী জীবন, এবং নগরজীবনের পারস্পারিক বিচ্ছিন্নতা, জটিল মনোবৃত্তি, নিষ্ঠুরতা, সন্দেহ, অবিশ্বাস প্রভৃতিকে উপজীব্য করে উপন্যাস লেখায় মনোনিবেশ করেন।

এই গবেষণা নিবন্ধে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালে রচিত প্রধান প্রধান ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে বাংলাদেশের জনজীবনের উপরে মূলত দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। আমরা জেনেছি বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে লেখকরা মূলত চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকেই সাফল্যের সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, শওকত ওসমান, আবুল ফজল, আবু ইসহাক, শহীদুল্লা কায়সার, জহির রায়হান, শামসুদ্দিন আবুল কালাম , সরদার জয়েনউদ্দীন, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সত্যেন সেন, রশিদ করিম, সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখ সাহিত্যিকের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের সফল রূপায়ণ হয়েছে বলে বিদগ্ধজনেরা মনে করেন। আমি এ প্রসঙ্গটি মনে রেখে গ্রামীণ উপন্যাস আলোচনায় মানুষের মূল্যবোধ, চিন্তাচেতনা ও সংকটকে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছি। বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি তাদের আবেগ-অনুভূতি, নগর ও গ্রামীণ সমাজের মানুষের আচরিত জীবন প্রভৃতি বিষয়ের উপর সূক্ষ্মভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যান থেকে আমার মনে হয়েছে, বাংলাদেশের সাহিত্যের ধারায় উপন্যাস সর্বাধিক সমৃদ্ধ। অবাস্তব বা অতিপ্রাকৃতের অবতারণা না করে বাস্তবতার শিল্প-প্রকরণ ও প্রবণতাকে গ্রহণ করে বিভাগোত্তর কালে আমাদের প্রথিতযশা সাহিত্যিকগণ উপন্যাস সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনানুভূতি, সন্তানবৎসল মায়ের জীবনের গভীরে নিমজ্জন ও বিচ্ছিন্নতা, সংসারে যাপিত জীবনের নানা বাঁকে নারী-পুরুষের মানসিক ও দৈহিক সম্পর্কের নানা কথা ঔপন্যাসিকদের নিরাভরণ বাকশৈলীতে পাঠকের মনে নানাবিধ প্রশ্নের উদ্রেক করে। বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যের মনোগ্রাহী এমন অনেক উপন্যাসের সংযোজন আমরা দেখতে পাই। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু*, *চাঁদের অমাবস্যা*, আবু ইসহাকের *সূর্য দীঘল বাড়ী*, শওকত ওসমানের *জননী*, *ক্রীতদাসের হাসি*, শহীদুল্লা কায়সারের *সারেং বৌ*, *সংশপ্তক*, জহির রায়হানের *হাজার বছর ধরে*, *আরেক ফাল্গুন*, আলাউদ্দিন আল আজাদের *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* প্রভৃতি উপন্যাসের ভিতর দিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

দেশ বিভাগের (১৯৪৭) সময় লেখা *লালসালু* উপন্যাসে আমরা যে অস্থিত্ববাদের কথা বলেছি, তা ইউরোপীয় ধাঁচে লেখা হলেও তা আমাদের সমাজ কাঠামোর ব্যর্থতার কথাই তুলে ধরে। এই ব্যর্থতাতেই প্রকৃতপক্ষে মজিদের উদ্ভব। *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসটির কথাও বলা যায়। মোল্লাতন্ত্রের মধ্যযুগীয় অন্ধকার কাটিয়ে উপন্যাসে জীবনের কথা বলা খুব একটা সহজ ছিল না। আবু ইসহাক এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সমাজের চোখে অপয়া বাড়ির পরিত্যক্ত আবর্জনা ঘেঁটেই তুলে এনেছেন জয়গুনের সংগ্রামী জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাহিনীতে সূক্ষ্মভাবে বর্ণিত হয়েছে দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট মানুষের মরণ-পণ লড়াইয়ের সঙ্গে শোষক শ্রেণীর নেকড়ে দৃষ্টি যা শুধু নারীর রক্তমাংসের স্বাদ পেতে চায়। *জননী* উপন্যাসটির ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। দারিদ্র্যেরও মূল্যবোধ থাকে, থাকে ঔচিত্যবোধ কিন্তু এসব কিছু ছাপিয়ে ওঠে ক্ষুধা ও আর্থিক

Dhaka University Institutional Repository

সংকটজনিত নানা উদ্যোগ। এই বিষয়ই যেন দরিয়া বিবির জীবনে সত্যি হয়ে উঠেছে । মা হয়েও সে জীবনসংগ্রামে হেরে গিয়েছে, আত্মহত্যাকেই অধিক সম্মানের মনে করেছে।

এই অভিসন্দর্ভের সীমিত পরিসরে মানুষের প্রকৃত জীবন ও সমাজ-সংলগ্ন বিষয়ে জনজীবনের স্বরূপটি এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় আমাদের মনে হয়েছে, বিভাগোত্তর কালের কথাসাহিত্যিকদের অর্জন বাংলাদেশের উপন্যাসকে অসামান্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আলোচিত উপন্যাস

আবু ইসহাক : সূর্য দীঘল-বাড়ী, ত্রয়োদশ মুদ্রণ ১৯৮৮, ঢাকা, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার

আবুল ফজল : জীবন পথের যাত্রী, আবুল ফজল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, আলাউদ্দিন আল আজাদ সম্পাদিত, ১৯৯৪ ঢাকা, বাংলা একাডেমী

: রাঙ্গা প্রভাত, আবুল ফজল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত

আলাউদ্দিন আল আজাদ : কর্ণফুলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৪, ঢাকা, মুক্তধারা

: ক্ষুধা ও আশা, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৭৪, প্রাগুক্ত

: তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, পঞ্চম প্রকাশ ১৩৯০, প্রাগুক্ত

: শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭৪, প্রাগুক্ত

জহির রায়হান : আরেক ফাল্গুন, জহির রায়হান রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, ১৯৮০ ঢাকা, বাংলা একাডেমীর পক্ষে আহমদ পাবলিশিং হাউস,

: বরফ গলা নদী, জহির রায়হান রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত

: হাজার বছর ধরে, জহির রায়হান রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত

: শেষ বিকেলের মেয়ে, জহির রায়হান, রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত

রশীদ করিম : উত্তম পুরুষ, ১৯৬১, ঢাকা, আনিস ব্রাদার্স

: প্রসন্ন পাষাণ, ১৯৬৩, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

শওকত ওসমান : জননী, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১, ঢাকা বুকস, ঢাকা

: ক্রীতদাসের হাসি, সপ্তম সংস্করণ ১৯৮৩, ঢাকা, মুক্তধারা

: জাহান্নাম হইতে বিদায়, ১৯৭১, কলিকাতা আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

শহীদুল্লা কায়াসার : সংশপ্তক, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৮২, ঢাকা, মুক্তধারা

: সারেং বৌ, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৮, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান

শামসুদ্দীন আবুল কালাম : কাশবনের কন্যা, পরিমার্জিত জয়ন্তী সংস্করণ ১৩৯৪, ঢাকা, মুক্তধারা

সরদার জয়েনউদ্‌দীন : আদিগন্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৫, ঢাকা, মুক্তধারা

: পান্নামোতি, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৭১, ঢাকা, ওসমানিয়া বুক ডিপো

: অনেক সূর্যের আশা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৪, চট্টগ্রাম, বইঘর

সত্যেন সেন : উত্তরণ, ১৯৭০, ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ

: পদচিহ্ন, ১৩৭৫, ঢাকা, কালিকলম প্রকাশনী

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : লালসালু, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-১, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, ১৯৮৬, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

: কাঁদো নদী কাঁদো, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী- ১, প্রাগুক্ত

: চাঁদের অমাবস্যা, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী- ১, প্রাগুক্ত

সৈয়দ শামসুল হক : এক মহিলার ছবি, ১৯৫৯, ঢাকা, সাহানা প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী বিল্ডিং

: দেয়ালের দেশ, ১৯৫৯, ঢাকা, আর্ট এ্যান্ড লেটার্স

: সীমানা ছাড়িয়ে, ১৯৬৪, ঢাকা, মওলা ব্রাদার্স

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক-গ্রন্থ

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় : কালের প্রতিমা, ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১, কলিকাতা, দ্বেজ পাবলিশিং

অশ্রুকুমার সিকাদার : আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, ১৯৮৮, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী

আনোয়ার পাশা : সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল, প্রথম প্রকাশ ১লা জুলাই ১৯৬৭, বই ঘর, চট্টগ্রাম

আহমদ কবির : সরদার জয়েনউদ্‌দীন, জীবনী গ্রন্থমালা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, বাংলা একাডেমী,ঢাকা

কামরুদ্দিন আহমদ : পূর্ব বাংলার সমাজ রাজনীতি, ১৩৭৪ ঢাকা, স্টুডেন্ট্স - পাবলিকেশন

: বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ , দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮২ ঢাকা, ইনসাইড লাইব্রেরী

করুণাময় গোস্বামী (সম্পাদিত) : বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ (১৩০১-১৪০০), ১লা মাঘ ১৪০০, সুধিজন পাঠাগার, নারায়ণগঞ্জ

ছন্দশ্রী পাল : বাংলাদেশের উপন্যাস: পরিবার ও সমাজ (১৯৪৭-২০০০) প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

জীনাত ইমতিয়াজ আলী : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: জীবন দর্শন ও সাহিত্য কর্ম, প্রকাশ কাল, নভেম্বর ১৯৯২, শিল্পতরু প্রকাশনী

ফজলুল হক সৈকত : সরদার জয়েনউদ্‌দীনের কথা সাহিত্য: সমাজ ও সমকাল, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশন, ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা

বদরুদ্দিন উমর : পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৫, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বজিৎ ঘোষ : বাংলাদেশের সাহিত্য, ১৯৯১, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

: বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মঈদুল হাসান : মূলধারা:'৭১, ১৯৮৬, ঢাকা, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড

মনসুর মুসা : পূর্ববাঙলার উপন্যাস, ১৯৭৪, ঢাকা, পূর্বলেখন প্রকাশনী

মুহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী : বাংলাদেশের উপন্যাসসাহিত্যে মধ্যবিত্তশ্রেণী, ১৯৮৫, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

: আমাদের উপন্যাসে বিষয়-চেতনা : বিভাগোত্তর কাল, ১৯৮৮, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

রফিকউল্লাহ খান : বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ (১৯৪৭-১৯৮৭), ১৯৯৭, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

রণেশ দাশগুপ্ত : উপন্যাসের শিল্পরূপ (১৯৫১), পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৩, ঢাকা, কালিকলম প্রকাশনী

রফিকুল ইসলাম : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯২, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী

রমেশ চন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯৪৫-১৯৪৭), চতুর্থ খণ্ড, ১৯৭৫, কলিকাতা

র‍্যাল্‌ফ্‌ ফক্‌স্‌ : নভেল এন্ড দ্যা পিপ্‌ল (অনুবাদ-সর্বজিৎ সেন/সিদ্ধার্থ ঘোষ), ১৯৮০, কলিকাতা পপুলার লাইব্রেরী, কলিকাতা

সরদার ফজলুল করিম : চল্লিশের দশকের ঢাকা, ১৯৯৪, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ

: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ, ১৯৯৩, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ

সেলিনা হোসেন, নূরুল ইসলাম (সম্পাদিত) : বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশকাল-ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৭৬, কলিকাতা ইস্টার্ন পাবলিশার্স

সৈয়দ আকরম হোসেন : বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ১৯৯৫, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

: 'বাংলাদেশের উপন্যাস: আঙ্গিক বিবেচনা', প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস, অরুণ সান্যাল সম্পাদিত (কলিকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৯১)

সৈয়দ আবুল মকসুদ : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, ডিসেম্বর ১৯৮১, ঢাকা, মিনার্ভা বুক্‌স হাউস

: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, নভেম্বর ১৯৮৩, প্রাগুক্ত

হাসান আজিজুল হক : কথাসাহিত্যের কথকতা, ১৯৮১, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী

হাসান হাফিজুর রহমান : একুশে ফেব্রুয়ারি (১৯৫৩), তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৮, ঢাকা, পুঁথিঘর প্রকাশনী

: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিল পত্র, প্রথম খণ্ড, ১৯৮২, ঢাকা তথ্যমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিল পত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত

সহায়ক প্রবন্ধ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : উপন্যাস ও সমাজ বাস্তবতা, সংস্কৃতি, (সম্পাদক-বদরুদ্দীন উমর) ২৫ বছর পূর্তি সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯৯, সংস্কৃতি প্রকাশনী, ৬৮/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা

আব্দুল মান্নান সৈয়দ : আলাউদ্দিন আল আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক ১০ জুলাই ২০০৯, পৃষ্ঠা-২১

Dhaka University Institutional Repository

এম এম আকাশ : সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা (১৯৪৭-১৯৭১), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), অর্থনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, সিরাজুল ইসলাম, ১৯৯৩, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

প্রেমেন্দ্র মিত্র : 'উপন্যাস প্রসঙ্গে', দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬৪

বদরুদ্দিন উমর : 'ভাষা আন্দোলন' বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) প্রথম খণ্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, ১৯৯৩, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

বিশ্বজিৎ ঘোষ : বহুমাত্রিক সৈয়দ শামসুল হক, দৈনিক ডেসটিনি ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৯, পৃষ্ঠা-০৭

রেহমান সোবহান : বাঙালী জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), দ্বিতীয় খণ্ড, অর্থনৈতিক ইতিহাস, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, ১৯৯৩, ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইট অব বাংলাদেশ

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন : 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ', বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, সম্পাদক : সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, মুনতাসীর মামুন, ১৯৮৬ বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি

সৈয়দ আকরম হোসেন : 'বাংলাদেশ', *বাংলাদেশ*, মনসুর মুসা সম্পাদিত, ১৯৯১, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান

সৈয়দ আজিজুল হক : 'শওকত ওসমানের রূপক উপন্যাস', সাহিত্য পত্রিকা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, ঊনত্রিংশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জুন ১৯৮৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রফিকউল্লাহ খান : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা এক শিল্পী, কালের খেয়া (সমকাল, শুক্রবারের সাহয়িকী), ৯ অক্টোবর, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

রামী চক্রবর্তী : জয়গুনের পৃথিবী ও না-পৃথিবী, এবং মুশায়েরা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, চতুর্দশ বর্ষ-দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭, শারদীয় ১৪১৪ উপন্যাস বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদক সুবল সামন্ত, ৩৮/এ/১, নবীন চন্দ্র দাশ রোড, কলকাতা-৭০০০৯০

শওকত আলী : উপন্যাস প্রসঙ্গ : লেখকের অবস্থান, শওকত আলীর প্রবন্ধ, শ্রাবণ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ৫ জানুয়ারি ২০০৩, ১৩২ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা

: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপনাস, শওকত আলীর প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত

: বাংলা উপন্যাসের বাস্তবতা প্রসঙ্গ: উনিশ শতক, শওকত আলীর প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত

: বাংলাদেশের কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ: শওকত আলীর প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত